কিশোর ক্লাসিক

টমাস হারডি-এর

দ্য মেয়র অব ক্যাস্টারব্রিজ

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ

মূল: টমাস হার্ডি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

গ্রীষ্মের শেষাশেষি কোন একদিন, সন্ধে ঘন হয়ে এসেছে। আপার ওয়েসেক্সের গণ্ডগ্রাম ওয়েডন-প্রায়র্সের উদ্দেশে হেঁটে চলেছে একজোড়া যুবক-যুবতী। যুবতীটির কোলে বাচ্চা। দীর্ঘ যাত্রায় পুরু হয়ে ধুলো জমেছে তাদের কাপড়ে, ফলে হতশ্রী দেখাচ্ছে।

ঋজু দেহ, কঠোর, কালচে মুখ লোকটির। সুতির পোশাক পরনে, মাথায় স্ট্র হ্যাট। পিঠে বেঁধে একখানা ঝুড়ি বইছে সে। ওটার মাথা টপকে উঁকি দিচ্ছে ক'খানা খড় কাটার যন্ত্রপাতি। লোকটার অবিচলিত, মাপা পদক্ষেপ জানান দিচ্ছে সে গাঁয়ের জীবনধারায় অভ্যস্ত।

অদ্ভুত ব্যাপার, যুবক-যুবতীর মধ্যে বাক্যালাপ হচ্ছে না। লোকটা কাগজে ছাপা একখানা গান মন দিয়ে পড়ছে, কিংবা পড়ার ভান করছে। আর মহিলার ভাবখানা এমন, যেন বাচ্চাটা ছাড়া তার সঙ্গে আর কেউ নেই। তার ফিসফিসানি আর বাচ্চা মেয়েটির অস্ফুট জবাবে মাঝেমধ্যে ভঙ্গ হচ্ছে নীরবতা।

যুবতী দেখতে সুদর্শনা নয়, তবে পাশ থেকে মেয়ের দিকে যখন চাইছে ভারি সুন্দর লাগছে। সে ধীর পায়ে হাঁটছে, ভাবছে কি যেন—তার মুখের চেহারায় গভীর হতাশার অভিব্যক্তি। সন্দেহের অবকাশ নেই, নারী-পুরুষ দু'জন স্বামী-স্ত্রী এবং শিশুকন্যাটির বাবা-মা।

সামনের দিকে বেশিরভাগ সময় স্থির থাকছে স্ত্রীর দৃষ্টি, তবে মন দিয়ে কিছু একটা যে লক্ষ করছে এমন নয়। পাখির ক্ষীণ কলকাকলি ছাড়া এ মুহূর্তে চারদিক নিস্তব্ধ। গাঁয়ের কাছাকাছি হতে, নানা ধরনের হৈ-চৈ আর শোরগোলের শব্দ কানে এল ওদের। ওয়েডন-প্রায়র্সের বাড়িগুলো দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। পরিবারটি এক খামার শ্রমিককে এসময় ওদের দিকে আসতে লক্ষ করল। যুবক স্বামীটি অবশেষে গানের পাতাটা থেকে চোখ তুলে চাইল।

'এখানে কাজ-টাজ আছে কিছু?' কাগজটা গাঁয়ের উদ্দেশে তাক করে ধরে প্রশ্ন করল যুবক। তৃণ শুকিয়ে খড় তৈরির কাজ করে সে।

শ্রমিকটি ইতোমধ্যেই মাথা নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। 'বছরের এসময়টায় ওয়েডন-প্রায়র্সের আশপাশে কাজ পাবে না।'

'ঘর তো ভাড়া পাওয়া যাবে, না কি? ছোটখাট কটেজ, এই ধরো নতুন হয়েছে?'

'এখানে বরং বাড়ি ভেঙে ফেলার কাজ চলছে। পাঁচটা ভাঙা পড়েছে গত

বছর, আর এবার এখন পর্যন্ত তিনটে। এ অবস্থাই চলছে ওয়েডন-প্রায়র্সে।'

মাথা নাড়ল যুবক হে-মেকার। গাঁয়ের দিকে চোখ রেখে কথার খেই ধরল, 'কিছু একটা হচ্ছে ওখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আজ মেলার দিন। তবে আসল ব্যবসা আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন চলছে বাচ্চাদের আর বোকাদের পয়সা খোয়ানোর পালা।'

হে-মেকার সপরিবারে এগিয়ে চলল, এবং শীঘ্রি প্রবেশ করল মেলার মাঠে। লোকটা ঠিকই বলেছিল, এখন চলছে বুদ্ধু বানিয়ে বাতিল জানোয়ার গছানোর ধান্ধা। তবু সকালের চাইতে লোক সমাগম এখন বেশি। ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে কেউ কেউ, দু'একজন সৈনিককে দেখা গেল, গাঁয়ের দোকানদাররা ঝাঁপ ফেলে শেষ বেলা মেলায় ঢুঁ মারতে এসেছে। মেলার যা স্বাভাবিক চরিত্র তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না এখানেও। বায়স্কোপের বাক্স, সর্বরোগনাশক ওষুধ, হস্তরেখাবিদ কি নেই।

আমাদের পরিব্রাজকদের কারও কোন উৎসাহ দেখা গেল না এসব ব্যাপারে। তারা চারদিকে নজর বুলাচ্ছে খাবারের তাঁবুর খোঁজে। কাছাকাছি দুটো তাঁবু পাওয়া গেল, দুটোই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এর একটা নতুন, ওটা থেকে লাল পতাকা উড়ছে কয়েকখানা। বীয়ার ও সাইডার পাওয়া যায় এখানে। অপর তাঁবুটা পুরানো ধাঁচের, পেছন থেকে লোহার ছোট এক স্টোভপাইপ বেরিয়েছে, আর সামনে লেখা রয়েছে, 'এখানে ভাল ফার্মিটি পাওয়া যায়।' দুটো তাঁবুর দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রথমটার উদ্দেশে পা বাড়াল যুবক।

'না-না-ওটায় চলো,' বলে উঠল তার স্ত্রী। 'আমার ফার্মিটি ভাল লাগে, এলিজাবেথ-জেনেরও। তোমারও খারাপ লাগবে না। সারাদিনের খাটুনির পর পুষ্টিকর কিছু খাওয়া দরকার।'

'আমি কোনদিন খাইনি,' বলল লোকটি। 'বেশ তো, চলো।'

ভেতরে প্রচুর লোকজন। তাঁবুর দু'দিকে দীর্ঘ, সরু টেবিলে বসে রয়েছে তারা। প্রকাণ্ড একটা পাত্র চড়ানো হয়েছে উনানে। তার তদারকি করছে এক বৃদ্ধা মহিলা। পেল্লায় এক সাদা অ্যাপ্রন গায়ে জড়ানোয় রীতিমত ভদ্রমহিলা মনে হচ্ছে তাকে। পাত্রে ফুটছে ভুট্টা দানা, ময়দা, দুধ, মনাক্কা, শুকনো আঙুর ও মশলা মেশানো এমন এক খাবার যা যুগ যুগ ধরে খেয়ে আসছে ওই এলাকার মানুষ।

ফুটন্ত মিশ্রণটির অর্ডার দিল ওরা দু'পাত্র, তারপর বসে পড়ল আর সবার মত। জিনিসটা দেখতে বিদঘুটে হলেও ভারি পুষ্টিকর।

যুবকটি খাওয়ার ফাঁকে চোখের কোণে লক্ষ করছে বুড়ীর কীর্তিকলাপ। এক পর্যায়ে চোখ টিপে পাত্রটা এগিয়ে দিল তার উদ্দেশে। টেবিলের নিচ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে খদ্দেরের পাত্রে খানিকটা রাম ঢেলে দিল মহিলা। অবৈধ সংযোজনটুকুর জন্যে বাড়তি পয়সা মেটাতে হলো যুবককে। এবার আগের চাইতে সুস্বাদু লাগছে তার কাছে খাবারটা। ওর স্ত্রী অস্বস্তির সঙ্গে গোটা বিষয়টা লক্ষ করল।

যুবক তার বাটি খালি করে আরেক বাটি চাইল, এবার রাম ঢালা হয়েছে আরেকটু বেশি। একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে গেল, নেশায় ধরেছে তাকে। বীয়ারের

বৈধ তাঁবুতে না ঢুকে আরও বরং খারাপ হলো এখন, টের পেল ওর স্ত্রী–চোরাচালানীদের মাঝে পড়ে গেছে ওরা।

বাচ্চাটা ওদিকে ক্রমেই বিরক্ত করে তুলছে। 'মাইকেল,' বলল যুবকের স্ত্রী। 'একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়। রাত হয়ে গেলে কোথায় খোঁজাখুঁজি করব?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। লোকটি চড়া গলায় আশপাশের লোকজনদের সঙ্গে কথা চালাচালি করছে। বাচ্চাটা একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

চার নম্বর বাটিটা সাবড়ে লোকটা হাউমাউ করে রীতিমত ঝগড়া পাকিয়ে তুলল। ওর মাতলামি মোড় নিল স্ত্রীর প্রতি অভিযোগে। দুষ্ট প্রকৃতির স্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে কত ভাল মানুষদের জীবনই না ধ্বংস হয়ে গেছে, অল্প বয়সে বিয়ে করে কত তরুণই না জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এসব কথা বয়ান করে চলল সে।

'আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে,' নিমের তেতো ঝরল যুবকের কণ্ঠে। 'আঠারো বছর বয়সে গাধার মত বিয়ে করতে গেছিলাম, এখন এই হচ্ছে তার ফল।' হাতের দোলায় নিজেকে ও পরিবারকে দেখিয়ে দিল সে।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হলো এসব কথা যেন তার গা সওয়া হয়ে গেছে, এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকটা ওদিকে বলে চলেছে, 'আমার কাছে এখন খুব বেশি হলে পনেরোটা শিলিং আছে, যদিও কাজে পাকা, অভিজ্ঞ লোক আমি। সংসার জীবন থেকে মুক্তি পেলে শেষ জীবনে এই আমার হাতেই এক হাজার পাউন্ড থাকবে কমসে কম। কিন্তু কথায় আছে না, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে? এখন গেছি ফেঁসে, দুঃখ করে কি হবে বলো?'

এমনিসময় বাইরের মাঠ থেকে ভেসে এল বুড়ো, বাতিল ঘোড়ার নিলামদারের গলা। 'আর একটাই আছে–কে নেবে এটাকে? চল্লিশ শিলিং হাঁকব? পাঁচ বছুরে মাদী ঘোড়া, এমনটা আর পাবে না। বেচারীর সবই ঠিক আছে, শুধু একটু যা হাড় জিরজিরে আর বাঁ চোখটা কানা।'

'যেসব স্বামীরা বউদের হাত থেকে বাঁচতে চায়,' বলল যুবক, 'তারাও তো ইচ্ছে করলে ওই ঘোড়াওয়ালার মত করতে পাবে। অবাঞ্ছিত বউদের নিলামে তুলে দিলে কেমন হয়, যার দরকার কিনে নিয়ে যাক। শোনো তোমরা, খদ্দের পেলে এই মুহূর্তে আমারটাকে বেচে দিতে রাজি আছি!'

'কেনার লোকও পেয়ে যাবে,' জবাব দিল এক খদ্দের। যুবতীর দিকে চোখ তার। নাহ, মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়।

'সত্যি কথা,' বলল অপর এক ভদ্রলোক। তাকে দেখে মনে হলো, অতীতে ধনী কোন পরিবারে সহিস কিংবা কোচোয়ানের কাজ করেছে। 'ভদ্রলোকদের চাকরি করেছি, ভাল বংশের মেয়ে দেখলেই চিনতে পারি। এই মেয়েও তেমনি একজন, প্রথম দর্শনে যদিও বোঝা যায় না।' এবার পা আড়াআড়ি করে, ছাদের দিকে চেয়ে বসে রইল সে।

মাতাল যুবক তার স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত তারিফ শুনে থমকে গেল ক'মুহূর্তের জন্যে, তারপর মাথা নেড়ে, চোখ পিটপিটিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, 'বেশ, সুযোগ

দিচ্ছি তোমাকে। দাম হাঁকো আমার বউয়ের জন্যে।'

বউটি স্বামীর দিকে ফিরে কাতর স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'মাইকেল, এসব ফালতু কথা-বার্তা তুমি আগেও বাইরের লোকেদের শুনিয়েছ। ঠাট্টা করে একবার দু'বার বললে ঠিক আছে, কিন্তু এবার তোমার সাবধান হওয়া উচিত।'

'জানি আগেও অনেকবার বলেছি। কিন্তু ঝোঁকের বশে কখনও বলিনি, এখনও বলছি না। সত্যি সত্যি আমি মুক্তি চাই।'

হেসে উঠল সবাই। মহিলা রীতিমত অপ্রস্তুত, ফিসফিস করে বলল, 'চলো, চলো, আঁধার হয়ে গেল তো। তুমি না গেলে আমি কিন্তু একাই যাব।'

অপেক্ষা করেই চলল সে, কিন্তু তার স্বামীর নড়ার লক্ষণ নেই। মিনিট দশেক পার করে লোকটা গর্জন ছাড়ল আবারও, 'কই, বললে না কে নেবে আমার মাল?'

মহিলার আচরণ মুহূর্তে পাল্টে গেল। কঠোর তার মুখ-চোখের অভিব্যক্তি। 'মাইক, মাইক, ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ রকম সিরিয়াস!'

'কেউ কিনবে একে?'

'কিনলেই ভাল,' দৃঢ়স্বরে বলল যুবতী। 'কেননা তোমাকে পছন্দ করি না আমি।'

'আমি তোমাকে পছন্দ করি ভেবেছ?' পাল্টা বলল লোকটি। 'আমরা যখন এ ব্যাপারে একমত, তখন আর একসাথে থাকা চলে না। এই, শুনলে তোমরা? ও চাইলে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে রাস্তা মাপতে পারে।.আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে আমার পথ ধরব। হ্যাঁ, এবার দাঁড়াও দেখি, সুসান, সবাই ভাল করে দেখুক তোমাকে।'

'ওর কথা শুনো না, বাছা,' কাছে বসে থাকা মোটাসোটা মহিলাটি আওড়াল। 'তোমার স্বামীর মাথার ঠিক নেই, যা খুশি তাই বকছে।'

যুবতী অবশ্য ঠিকই উঠে দাঁড়াল।

'কেউ আছ নাকি, ভাই, আমার হয়ে নিলাম ডাকবে?' স্বামী চিৎকার ছাড়ল।

'আমি আছি,' ঝটিতি জবাব দিল লাল নাক ও কুতকুতে চোখের অধিকারী এক লোক। 'এই মহিলার জন্যে দাম হাঁকার কেউ আছ?'

মহিলার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ, অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে যেন।

'পাঁচ শিলিং,' বলল কেউ একজন, গলা ছেড়ে হাসছে।

'অপমান করা চলবে না,' বলল স্বামীটি। 'এক স্বর্ণমুদ্রা বলার কেউ আছ?'

সবাই লা জবাব, এসময় বিশালবপু সেই মহিলা হস্তক্ষেপ করল। 'ভুল কোরো না, ভালমানুষের পো, ঈশ্বরের দোহাই লাগে। আহা বেচারী, কী জালিম লোকের পাল্লাতেই না পড়েছে!'

'দামটা আরও চড়িয়ে দাও, নিলামদার,' বলল মেয়েটির স্বামী।

'দুই গিনি!' হাঁকল নিলামদার, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

'দশ সেকেন্ড সময় দিলাম, এরপর দাম আরও চড়ানো হবে,' ঘোষণা করল যুবক স্বামী। 'বেশ, নিলামদার, আরেক গিনি যোগ করো।'

'তিন গিনি–কেউ আছ তিন গিনি বলার মত?'

'নেই?' বলল স্বামীটি। 'অথচ এর পেছনে আমার এরমধ্যেই অন্তত পঞ্চাশ গুণ বেশি খরচা করা হয়ে গেছে। চালিয়ে যাও।'

'চার গিনি!' নিলামদার হাঁকল।

'তোমাদের বলে দিচ্ছি–পাঁচের কমে একে বেচব না,' বলে স্বামীটি দুম করে এমন এক কিল মারল টেবিলে, নেচে উঠল বাটিগুলো। 'পাঁচ গিনি যে দেবে আর ওর সাথে সদ্ব্যবহার করবে বলে কথা দেবে, তার হাতেই তুলে দেব। এই মেয়ের ওপর আমার আর কোন দাবি থাকবে না, কোনদিন মুখ দেখাতেও যাব না। কিন্তু পাঁচের কমে ছাড়ছি না। কই–পাঁচ গিনি দাও–নিয়ে যাও ওকে। সুসান, তুমি রাজি?'

মাথা নোয়াল সুসান। জবাব দিল না।

'পাঁচ গিনি,' বলল নিলামদার, 'নইলে নিলাম ডাকা বন্ধ। দেবে কেউ? শেষবারের মত বলছি। হ্যাঁ, নাকি না?'

'হ্যাঁ,' দোরগোড়া থেকে গমগম করে উঠল একটি কণ্ঠস্বর।

সবার দৃষ্টি চলে গেল ওদিকে। তাঁবুর তেকোনা মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে এক নাবিক। সবার অলক্ষে মিনিট দু-তিনেক আগে উদয় হয়েছে সে। তার জবাবের পর কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল তাঁবুর ভেতর।

'তুমি দেবে বলছ?' একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল স্বামীটি।

'হ্যাঁ।'

'বলা সহজ, কিন্তু করা কঠিন। টাকা কই?'

নাবিকটি মুহূর্তের দ্বিধার পর, নিলামে-ওঠা যুবতীর দিকে আরেক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। এবার এগিয়ে এসে, কড়কড়ে পাঁচখানা কাগজের ভাঁজ খুলে, টেবিল ক্লথের ওপর ছুঁড়ে দিল। ব্যাঙ্ক-অভ-ইংল্যান্ডের পাঁচ পাউন্ডের পাঁচখানা নোট। টাকার ওপর পাঁচটা শিলিং চাপা দিল ও।

ঘটনার আকস্মিকতায় থ বনে গেছে দর্শকরা। এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ নিশ্চিত ছিল না, স্বামীটি আন্তরিক কিনা। সবাই ধরে নিয়েছিল তামাশা হচ্ছে বুঝি। কিন্তু এবারে জলজ্যান্ত টাকার আবির্ভাব ঘটতে হালকা ভাবটুকু আর রইল না। পাল্টে গেল গোটা দৃশ্যপট। হাসি মুছে গেছে শ্রোতাদের, মুখ হাঁ করে পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই।

'শোনো, মাইকেল,' নীরবতা ভঙ্গ করল যুবতী। তার অনুচ্চ, খসখসে কণ্ঠস্বর জোরাল হয়ে বাজল সবার কানে। 'তুমি ও টাকা স্পর্শ করলে মেয়েকে নিয়ে আমার চলে যেতে হবে। একটু বোঝার চেষ্টা করো, ব্যাপারটা আর ঠাট্টার পর্যায়ে নেই!'

'ঠাট্টা? মোটেও ঠাট্টা নয়?' কথাটা শুনে খেপে উঠেছে স্বামীটি। 'টাকা আমি নিচ্ছি। আর নাবিক নিচ্ছে তোমাকে। এই-ই শেষ কথা। এ ঘটনা অনেকখানে ঘটেছে, এখানে ঘটতে অসুবিধা কি!'

'মেয়েটা রাজি থাকলে তবেই কেনার কথা ওঠে,' মৃদু স্বরে বলল নাবিক। 'আমি ওর মনে কষ্ট দিতে চাই না।'

'আমিও চাই না,' বলল স্বামীটি। 'ও রাজি আছে, বাচ্চাটাকে তো নিয়ে যাচ্ছে। এই সেদিনও তো বলেছে ওর আপত্তি নেই।'

'কথাটা কি সত্যি?' নাবিক প্রশ্ন করল যুবতীকে।

'সত্যি,' যুবতী স্বামীর কঠোর মুখখানার ওপর এক নজর দৃষ্টি বুলিয়ে বলল।

'বেশ, তো দর কষাকষি খতম,' বলল স্বামীটি। নাবিকের টাকা কটা ভাঁজ করে শিলিংগুলো সহ ভরে রাখল এক পকেটে। তার হাবে-ভাবে পরিষ্কার হলো, কথা শেষ।

নাবিকটি যুবতীর দিকে চেয়ে স্মিত হাসল। 'এসো!' নরম সুরে ডাকল। 'বাচ্চাটাকেও নিয়ে নাও–মানুষ যত বেশি, জীবনে তত আনন্দ-খুশি!' মুহূর্তের জন্যে থমকাল মেয়েটি, লোকটির দিকে এক পলক চাইল। এবার দৃষ্টি ফের নত করে, বাচ্চাটাকে তুলে নিল। নাবিককে অনুসরণ করল বিনাবাক্যব্যয়ে। তাঁবুর দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল। আঙুল থেকে বিয়ের আঙটিটা খুলে ছুঁড়ে মারল প্রাক্তন স্বামীর মুখ লক্ষ্য করে।

'মাইক!' বলল ও, 'দু'বছরের সংসার জীবনে দুর্ব্যবহার ছাড়া তোমার কাছ থেকে আর কিছু পাইনি। এখন তোমার সাথে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। দেখি অন্য কোথাও কপাল ঠুকে। আমার আর এলিজাবেথ-জেনের জন্যে সেই-ই ভাল হবে। চলি!'

ডান হাতে নাবিকের বাহু আঁকড়ে ধরল ও, আর বাঁ হাতে বইছে কোলের বাচ্চাটিকে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁবু ত্যাগ করল হতভাগী সুসান।

উদ্বেগের ছায়া পড়ল মাতাল স্বামীর মুখের চেহারায়। এধরনের সমাপ্তি বোধহয় আশা করেনি সে। দর্শকদের কেউ কেউ ওর মুখের ওপর হাসছে।

'ও চলে গেছে?' প্রশ্ন করল যুবক।

'হ্যাঁ, চলে গেছে,' দরজার কাছ থেকে জানানো হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে তাঁবুর প্রবেশমুখের উদ্দেশে এগিয়ে গেল লোকটি। ওকে অনুসরণ করল জনা কয় দর্শক, সন্ধ্যালোকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

'নাবিক লোকটা থাকে কোথায়?' একজন প্রশ্ন করল।

'আল্লাই জানে,' জবাব দিল আরেকজন। 'লোকটা এখানে নতুন।'

'মিনিট পাঁচেক আগে এসেছিল লোকটা,' বলল ফার্মিটি বিক্রেতা মহিলা, কোমরে দু'হাত রেখে ভিড়ে গেছে আর সবার সঙ্গে। 'পিছিয়ে গিয়ে আবার এসে উঁকি দেয়।'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে স্বামীটার,' স্থূলকায় মহিলা মত প্রকাশ করল। 'এরকম একটা মেয়েকে এভাবে অপমান করল…মেয়েটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। আমার স্বামী এমন দুর্ব্যবহার করলে আমিও ঠিক একাজটাই করতাম।'

'মেয়েটা খারাপ থাকবে না,' বলল অপরজন। 'নাবিকরা সাধারণত লোক খারাপ হয় না, আর ওই লোকের মালকড়ি আছে বলে মনে হলো। যতটা যা দেখলাম, মেয়েটা টাকার কষ্টে ছিল।'

'গেছে যাক, আমি ওকে ফেরাতে যাচ্ছি না,' গোঁয়ারের মত বলে নিজের আসনে ফিরে এল হে-মেকার। 'যেতে দাও! এর শাস্তি ওকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল কোন্ অধিকারে? ও আমার মেয়ে; এ ঘটনা আবার ঘটলে বাচ্চাটাকে কিছুতেই পেত না ও!'

হয়তো পাপের সাক্ষী থেকেছে বলে, কিংবা হয়তো রাত হয়ে যাচ্ছে বলে খদ্দেররা শীঘ্রি যে যার পথ ধরল। লোকটি টেবিলে কনুই বিছিয়ে, তার ওপর মাথা রেখে, একটু পরেই নাক ডাকাতে লাগল। দোকান বন্ধ করে দেবে ফার্মিটি বিক্রেতা আজ রাতের মত। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু ঘুম ভাঙাতে পারল না। আজ রাতে তাঁবু যেহেতু গোটানো হচ্ছে না, ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, ভাবল মহিলা। শেষ মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে, তাঁবুর ঢাকনা নামিয়ে চলে গেল সে।

ক্যানভাসের তাঁবুর ছেঁড়া এক অংশ গলে ভোরের আলো এসে পড়তে ঘুম ভাঙল লোকটির। ভয়ানক গরম লাগল তার, প্রকাণ্ড এক নীল মাছি ভনভন করে ঘুরছে। এছাড়া চারদিক নীরব। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল ও—বেঞ্চ, টেবিল ও তার যন্ত্রপাতির ঝুড়িটা দেখতে পেল। টুকিটাকি নানান কিছুর মধ্যে ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল খুদে, চকচকে একটি জিনিস। ওটা তুলে নিল সে। ওর স্ত্রীর আঙটি।

গত সন্ধেবেলার সমস্ত ঘটনার চিত্র একে একে ফিরে আসতে শুরু করলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সে; নিশ্চিত হওয়ার জন্যে চকিতে পকেটে হাত চালিয়ে দিল লোকটি। কাগজের খসখস শব্দ মনে করিয়ে দিল নাবিকের দেয়া ব্যাঙ্কনোটগুলোর কথা।

আর প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন নয় পরিষ্কার টের পেল। ঠায় বসে রইল ও মাটিতে দৃষ্টি ধরে রেখে। পুরোটা ঘটনা স্মরণ করল সে। এবার উঠে দাঁড়াল, পা চালিয়ে বেরিয়ে এল বাইরের মুক্ত বাতাসে।

বিষণ্ন কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল লোকটি। সেপ্টেম্বরের তরতাজা সকাল অনেকখানি চাঙা করে তুলল ওকে। কাল প্রায় কিছুই দেখতে পায়নি, আজ যেন প্রথমবারের মত দৃষ্টিগোচর হলো এখানকার পরিবেশ। খোলামেলা এক পাহাড়চূড়ায় এই মেলার মাঠটা। আঁকাবাঁকা এক রাস্তা উঠে এসেছে পাহাড়ের উদ্দেশে। পাহাড়ের এক পাশে বনের চিহ্ন, পায়ের কাছে গাঁ-টা গড়ে উঠেছে। সূর্যের প্রথম আলোয় গোটা দৃশ্যপট উদ্ভাসিত।

যাযাবর ও অন্যান্য খেলোয়াড়রা যার যার মালগাড়ি আর তাঁবুতে ঘুমে মগ্ন। চারদিক সুনসান। মাঝেমধ্যে কেবল নাক ডাকার শব্দে চিড় ধরছে নীরবতায়। এক দঙ্গল কুকুরের মধ্যে একটা কুকুর মালগাড়ির নিচ থেকে সহসা খেঁকিয়ে উঠল, তারপর আবারও ঢলে পড়ল ঘুমের অতলে। ওয়েডন-প্রায়র্সের মেলার মাঠ থেকে হে-মেকারের বিদায় নেয়ার সাক্ষী থাকল একমাত্র ওটাই।

হে-মেকারও ঠিক এমনটাই চাইছিল। আপন ভাবনায় বুঁদ হয়ে পথ চলছে সে। ঝোপের পাখি, ব্যাঙের ছাতা, ভেড়ার ঘণ্টি সব কিছুই তার মনোযোগ কাড়তে ব্যর্থ হলো। একটি গলির কাছে পৌঁছল ও প্রায় মাইল খানেক পথ পাড়ি দিয়ে। ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে একটা গেটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দু'একটা কঠিন সমস্যা চিন্তাচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে।

'কাল রাতে কারও কাছে নিজের নাম বলেছি, নাকি বলিনি?' নিজেকে প্রশ্ন করে শেষমেশ সিদ্ধান্ত টানল, বলেনি। বিরক্ত-চমকিত সে, ওর বউ কেন ধরে নিল ও মন থেকে অমন প্রস্তাব দিয়েছে? আগের বারের এক ঘটনা মনে পড়ল।

সেবারও নেশায় চুর হয়ে পড়ে সে, বিদেয় করে দিতে চায় স্ত্রীকে। সে কিন্তু জবাবে বলেছিল, 'একথা বলার সুযোগ আর খুব বেশি বার পাবে না, মাইকেল।' কিন্তু নিজের মনে যুক্তি খাড়া করল লোকটা। 'আমি কি বুঝে বলি, আমি তো নেশার ঘোরে কি বলতে কি বলি। সেটা কি ও বোঝে না? ওকে খুঁজে বেড়াব আমি। ও কিভাবে এমন একটা কাজ করতে পারল? ও তো আর আমার মত মাতাল ছিল না। আসলে ও মানুষটাই এরকম। ওর নির্লিপ্ত ভাব ওর বদমেজাজের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আমার!'

মনটা শান্ত হলে পর উপলব্ধি করল ও, যেভাবে হোক বউ-বাচ্চাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং ভয়াবহ এই গ্লানি মুছে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। অপকর্মটার হোতা যেহেতু ও নিজে, কাজেই ওকেই এর দায়ভার বইতে হবে। কিন্তু সেজন্যে প্রথমে দরকার শপথ নেয়া, যেমনটা আর কখনও নেয়নি ও–আর সুষ্ঠুভাবে একাজটি করার জন্যে চাই উপযুক্ত পরিবেশ।

ঝুড়িটা তুলে নিয়ে আবার হাঁটা দিল ও, সদাচঞ্চল চোখ ওর খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশেষ একটি দালান। দূরবর্তী গাঁয়ের বাড়ি-ঘরের ছাদ চোখে পড়ল ওর এবং সেসঙ্গে গির্জার মিনার। গাঁ-টা এমুহূর্তে নির্জন, নিঃশব্দ। সবার অগোচরে গির্জায় পৌঁছে গেল লোকটা। দরজার কাছে ঝুড়িটা রেখে বেদীতে গিয়ে উঠল। বেদীর ঠিক নিচে সিঁড়ির ধাপে হাঁটু গেড়ে বসে, বেদীর সামনে যথারীতি রাখা বাইবেলের ওপর মাথা ঠেকাল। এবার গমগমে স্বরে ঘোষণা করল: 'আমি মাইকেল হেঞ্চার্ড, ষোলোই সেপ্টেম্বরের সকালে ঈশ্বরের সামনে পবিত্র এই স্থানে শপথ নিয়ে বলছি, আগামী একুশ বছর আমি সব ধরনের কড়া পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকব, আমার বয়স এখন যত বছর, তত বছরের জন্যে এ প্রতিজ্ঞা করলাম। আমার সামনে রাখা পবিত্র গ্রন্থে মাথা ছুঁইয়ে শপথ নিলাম, এর অন্যথা হলে আমি যেন বোবা, অন্ধ আর অক্ষম হয়ে পড়ি!'

একথাগুলো আওড়ে বাইবেলে চুমো খেল লোকটা, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। জীবনে যেন নতুন দিক নির্দেশনা পেয়েছে সে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতে লক্ষ করল, কাছের কুটির থেকে চিমনির ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, কুটিরবাসী এইমাত্র আগুন জ্বেলেছে। সে কুটিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। তার অনুরোধে, কুটিরের কর্ত্রী সামান্য পয়সার বিনিময়ে নাস্তার ব্যবস্থা করে দিতে রাজি হলো। খাওয়া সেরে, পয়সা মিটিয়ে বউ-বাচ্চার খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়ল ও।

কাজটা কতখানি কঠিন শীঘ্রিই টের পেয়ে গেল। কাল সন্ধের পর থেকে ওদেরকে আর কেউ দেখেনি। নাবিকটির নাম জানা না থাকায় আরও ঘোলাটে হয়ে গেল পরিস্থিতি। সঙ্গে টাকা-পয়সা যৎসামান্য, কাজেই খানিক দ্বিধার পর, নাবিকের কাছ থেকে নেয়া টাকা তল্লাশীর কাজে ব্যবহার করবে ঠিক করল ও। কিন্তু কোন ফল হলো না। আসল সমস্যা অন্যখানে। মাইকেল হেঞ্চার্ড তো কাউকে খুলে বলতে পারছে না পুরো ঘটনা, ফলে আশানুরূপ সাহায্যও পাচ্ছে না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, খুঁজে চলেছে সে বউ-বাচ্চাকে, তার ফাঁকে ছোটখাট কাজ-কর্ম করে পেট চালাচ্ছে। শেষমেশ এক সমুদ্রবন্দরে এসে জানতে

পারল, ও যাদের খুঁজছে তেমন চেহারার মানুষরা আমেরিকার উদ্দেশে অল্পক্ষণ আগে দেশত্যাগ করেছে। হাল ছেড়ে দিল ও, আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। পরদিন দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করল ও, বিরতি দিল কেবলমাত্র রাতের বেলা, অবশেষে পৌঁছল এসে ক্যাস্টারব্রিজ শহরে–ওয়েসেক্সের সুদূরবর্তী এক অঞ্চলে।

দুই

ওয়েডন-প্রায়র্স গাঁয়ে প্রবেশের রাস্তাটা আরেকবার ঢেকে গেছে পুরু ধুলোয়। গাছ-গাছালি সেই আগের মতই ধূলিধূসরিত সবুজ। হেঞ্চার্ড পরিবারের তিনজন একদা যে পথ চলেছিল, সে পরিবারের দু'জন সদস্য এখন ও পথ ধরে হেঁটে চলেছে।

উনিশ বছর গড়িয়ে গেলেও, বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই। এমনকি মেলার মাঠ থেকে ভেসে-আসা শব্দ সেই আগের মতই শোনাচ্ছে। যে দু'জন এ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে তাদের একজন হেঞ্চার্ডের সেই তরুণী স্ত্রী। তার মুখখানা এখন অনেকখানি বসে গেছে, গায়ের চামড়া অন্যরকম; চুলের রং তেমনি থাকলেও আগের চেয়ে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। বিধবার শোকপোশাক তার পরনে। মহিলার সঙ্গিনী এক আঠারো বছরের তরুণী, কালো কাপড় তার গায়েও। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, এটি সুসান হেঞ্চার্ডের উঠতি বয়সের মেয়ে।

গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে, আগেকার সেই রাস্তা দিয়ে মেলার উদ্দেশে হেঁটে চলল ওরা। পরিবর্তন স্পষ্ট হলো এখানেও। নাগরদোলা ও অন্যান্য প্রমোদক্রীড়ায় যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্টি কাড়ে। তবে মেলার মূল কারবার আর তেমন রমরমা নেই। এখানকার শতাব্দী প্রাচীন বেশিরভাগ ব্যবসা কেড়ে নিয়েছে আশপাশের শহরে গজিয়ে ওঠা নতুন নতুন বাজার-হাটগুলো। ভেড়ার খোঁয়াড় ও ঘোড়া রাখার জায়গা এখন আগের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ছোটখাট দোকানদাররা নিশ্চিহ্ন। মা-মেয়ে জনতার ভিড় ঠেলে খানিকদূর এগিয়ে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমরা এখানে এসে খামোকা সময় নষ্ট করলাম কেন? তুমি আরও সামনে যেতে চাও ভেবেছিলাম,' বলল মেয়েটি।

'হ্যাঁ রে, এলিজাবেথ-জেন, তাই চাই,' ব্যাখ্যা করল অপরজন। 'কিন্তু এখানে একটু ঢুঁ মারতে ইচ্ছে করল।'

'কেন?'

'এখানে নিউসনের সাথে আমার প্রথম দেখা–এমনি এক দিনে।'

'বাবার সঙ্গে এখানে প্রথম দেখা হয়? ও হ্যাঁ, আগেও তো বলেছ। আহা, বাবা যদি এখন বেঁচে থাকত!' মেয়েটি পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে ওটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোনাগুলো কালো রঙ করা, ওতে একথাগুলো লেখা: 'নাবিক রিচার্ড নিউসনের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে, ১৮৪০ সালের

নভেম্বর মাসে যিনি একচল্লিশ বছর বয়সে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সমুদ্রে হারিয়ে যান।'

'আর এখন যে আত্মীয়টির খোঁজে যাচ্ছি,' মার কণ্ঠে দ্বিধা ফুটল, 'তার সাথেও আমার শেষ দেখা এখানে। মি. মাইকেল হেঞ্চার্ডের কথা বলছি।'

'উনি আসলে আমাদের কি হন, মা? তুমি তো কখনোই পরিষ্কার করে বলোনি।'

'বিয়ের সূত্র ধরে তার সাথে সম্পর্ক। এখন বেঁচে আছে না মারা গেছে তাও জানি না,' বলল মা।

'একথা তো কমসে কম বিশবার শুনেছি!' মার উদ্দেশে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলল মেয়ে, 'উনি নিকট আত্মীয় কেউ না, তাই না?'

'না।'

'উনি হে-মেকার ছিলেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে নিশ্চয়ই চেনেন না?' মেয়েটি সরল মনে প্রশ্ন করে চলে।

মিসেস হেঞ্চার্ড মুহূর্তের জন্যে থমকাল, তারপর দ্বিধা ভরে বলল, 'প্রশ্নই ওঠে না, এলিজাবেথ-জেন। এদিকে আয়।' মাঠের আরেক ধারে সরে এল সে।

'এখানে জিজ্ঞেস করে লাভ হবে মনে হয় না।' বলল মেয়ে, চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। 'মেলার লোকজন গাছের পাতার মত বদলায়। অত বছর আগে যারা এখানে ছিল তাদের কারও এখন থাকার কথা নয়।'

'কে জানে,' বলল মিসেস নিউসন, এনামেই এখন নিজের পরিচয় দেয় সে—সাগ্রহে চেয়ে রইল খানিক দূরের কিছু একটার উদ্দেশে। 'ওই দেখ।'

মার নির্দেশিত পথে দৃষ্টি রাখল মেয়ে। মাটিতে তিন কোনায় তিনটে লাঠি গেঁথে তার ওপর চড়ানো হয়েছে তিনপেয়ে এক পাত্র, নিচে জ্বলছে খড়ির আগুন। পাত্রটির ওপর ঝুঁকে পড়েছে এক লোলচর্ম বৃদ্ধা, পরনে তার তালি-পট্টি মারা পোশাক। পেল্লায় এক চামচ দিয়ে নাড়ছে সে পাত্রের ভেতরটা, আর মাঝে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠছে ভাঙা গলায়: 'চাই সুস্বাদু ফার্মিটি!'

এ সেই তাঁবুর মহিলা, এক কালে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা অ্যাপ্রন পরে রমরমা ব্যবসা করত। এখন আর তার তাঁবু নেই, নেই বেঞ্চি কিংবা টেবিলও। নোংরা মত দুটো বাচ্চা ছেলে ছাড়া খদ্দেরও দেখা গেল না অন্য কোন। তারা আধ পেনির ফার্মিটি চাইল বৃদ্ধার কাছে।

'এই মহিলাকে তখনও দেখেছি,' বলল মিসেস নিউসন, এক পা এগোল কথা বলার জন্যে।

'ওর কাছে যেয়ো না—ব্যাপারটা অসম্মানজনক,' বলল তার মেয়ে।

'শুধু একটা কথা জেনে আসছি। তুই এখানে থাক, তোর যাওয়ার দরকার নেই।'

মেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, আর মা গেল এগিয়ে। তাকে দেখামাত্র বৃদ্ধা পীড়াপীড়ি শুরু করল ফার্মিটি কেনার জন্যে। এক পেনি দিয়ে মহিলা ফার্মিটি কিনতে ভারি খুশি হলো সে। বিধবা পাতলা, অখাদ্য পানীয়র বাটিটা হাতে নিতে বৃদ্ধা ধূর্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল, 'রাম দেব? চোরাই মাল বোঝোই তো। বেশি

না, মাত্র এক পেনি–স্বাদই পাল্টে যাবে!'

সেই পুরানো কৌশল, তিক্ত হাসি হাসল তার খদ্দের–মাথা নাড়ল। মিসেস নিউসন অল্প একটু ফার্মিটি মুখে দেয়ার ভান করে, নিরীহ কণ্ঠে বুড়ীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'একসময় নিশ্চয়ই ভাল ব্যবসা করেছেন?'

ব্যস, মুখের অর্গল খুলে গেল বুড়ীর। 'উনচল্লিশ বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছি। কে না খেয়েছে আমার ফার্মিটি। এলাকার ধনী লোকেরাও আসত মিসেস গুডএনাফের হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে। কী বিশাল তাঁবুই না তখন ছিল আমার, ওটা ছিল এই মেলার সেরা আকর্ষণ। এখানে আসতেই হত সবাইকে। কিন্তু পুরানো কথা কেউ মনে রাখে না, বুঝলে? সৎ পথে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। এখন তো চারদিকে চোঁর-বাটপাড়দের রাজত্ব!'

মিসেস নিউসন নজর বুলিয়ে দেখল, তার মেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে। 'আপনার কি মনে পড়ে,' বৃদ্ধার উদ্দেশে সতর্কতার সঙ্গে বলল সে, 'উনিশ বছর আগে আজকের দিনে এক লোক তার বউকে বেচে দেয়, ঘটনাটা ঘটে আপনারই তাঁবুতে?'

বৃদ্ধা চিন্তামগ্ন হয়ে ঈষৎ মাথা দোলাল। 'গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলে আমার মনে পড়ত,' বলল সে। 'খুন-খারাপি, বড় ধরনের চুরি, বিবাহিত লোকজনের মধ্যে মারামারি–মানে মনে রাখার মত সব ঘটনাই স্মরণ আছে আমার। কিন্তু বউ বিক্রি? ঘটনাটা কি চুপেচাপে ঘটেছিল?'

'সম্ভবত তাই।'

আবারও সামান্য মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। 'তারপরও অল্প অল্প মনে পড়ছে। এক লোক ও ধরনের কাজ করেছিল বৈকি–কর্ডের জ্যাকেট ছিল তার গায়ে, আর সঙ্গে ছিল যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ঝুড়ি। কিন্তু আমরা আসলে ওসব ব্যাপার মনে রাখি না। এ লোকের কথা মনে আছে, কেননা সে পরের বছর আবার মেলায় এসেছিল। আমাকে গোপনে বলে গেছিল, কোন মহিলা কখনও তাকে খুঁজলে বলতে হবে সে–কোথায় যেন–ক্যাস্টারব্রিজ গেছে। এতদিন কেউ জিজ্ঞেস করেনি, ফলে ভুলেই গেছিলাম!'

এই বুড়ীটা যদি সে ঘটনার জন্যে দায়ী না হত তবে হয়তো তাকে পুরস্কৃত করত মিসেস নিউসন। কিন্তু এ-ই তো রাম খাইয়ে তার স্বামীর মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছিল। সংক্ষেপে বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে এল সে।

'মা, যাবে চলো। ওখান থেকে কিছু কেনাটা তোমার ঠিক হয়নি।'

'যা জানার জানা হয়ে গেছে,' শান্ত সুরে বলল মা। 'আমাদের আত্মীয় এখন নাকি ক্যাস্টারব্রিজে থাকে, শেষ যেবার এসেছিল বলে গেছে। ক্যাস্টারব্রিজ এখান থেকে বহু দূর। আর ওখানে থাকে সেও বহু বছর আগে বলেছে। তবে আমার মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত।' মেলার মাঠ ছেড়ে রওনা দিল ওরা।

হেঞ্চার্ডের স্ত্রী অনেকবারই মেয়েকে তার জীবনকাহিনী খুলে বলতে চেয়েও পারেনি। মেয়ে যদি সব জেনে দুঃখ পায় এই ভয়ে। বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সুসান হেঞ্চার্ডের অভিজ্ঞতা দুটো-তিনটে বাক্যে সেরে ফেলা যায়। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় নিউসনের সঙ্গে কানাডা যায় সে, বেশ ক'বছর ওখানে বাস করেও ভাগ্য

ফেরাতে পারেনি তারা। এলিজাবেথ-জেন যখন বারোর কাছাকাছি, তখন পরিবারটি ইংল্যান্ডে ফিরে এসে ফলমাউথে থিতু হয়। নিউসন এখানে বেশ ক'বছর মাঝির কাজ করে, সে সঙ্গে ডাঙায়ও কাজ চালিয়ে যায় সুযোগ পেলে।

অবশেষে সে নিউফাউন্ডল্যান্ড রুটে নাবিকের চাকরি পায়। সুসান এ সময়ে এসে উপলব্ধি করতে শুরু করে কী কাজটা সে করেছে। এক বান্ধবীকে জীবনকাহিনী খুলে বলাতে সে ঠাট্টা করে ওর বর্তমান পরিচয় নিয়ে। ফলে, মনের শান্তি হারাম হয়ে যায় সুসানের। এক শীত মৌসুমের শেষাশেষি নিউসন ফিরে এসে ওর পরিবর্তন লক্ষ করে।

বিষাদগ্রস্ত সুসান এক সময় নিউসনকে জানায়, ওদের একসঙ্গে থাকাটা সম্ভবত অনৈতিক হচ্ছে। মৌসুম এলে নিউসন আবার রওনা দিল নিউফাউন্ডল্যান্ড অভিমুখে। কিছুদিন পর তার সাগরে নিখোঁজ হওয়ার খবরটা পেতে বিবেকের দংশন অনেকখানি কমে আসে সুসানের। এরপর আর দেখা হয়নি দু'জনের।

নাবিক নিউসন, জীবিত হোক কিংবা মৃত, সরে যায় ওদের জীবন থেকে। সুসান সিদ্ধান্ত নেয় সে তার প্রথম স্বামীর খোঁজ বের করবে। সমস্যা একটাই, এলিজাবেথকে কি বলবে। অবশেষে ঠিক করল, মুখ বন্ধ রাখবে। হেঞ্চার্ডকে পাওয়া তো যাক আগে, তারপর যা করার সে লোকই করবে।

কাজেই পথে বেরোল ওরা। সঙ্গে টাকা-পয়সা কম, ফলে সতর্ক থাকতে হয়েছে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনওবা চাষীদের ওয়াগনে কিংবা বণিকদের মালগাড়িতে চেপে পথ পাড়ি দিয়েছে তারা। এভাবে অবশেষে ক্যাস্টারব্রিজের কাছাকাছি এসে পড়ে। এলিজাবেথ-জেন টের পায়, ওর মার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে, এবং সে যেন জীবনের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত।

শুক্রবারের এক সন্ধেবেলা, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এক পাহাড়চূড়ায় উঠে এল ওরা। আর মাইলখানেকের মধ্যে ওদের গন্তব্যস্থান। রাস্তার কিনারে বসে, নিচের ক্যাস্টারব্রিজ শহর ও তার পরিপার্শ্ব দু'চোখ ভরে দেখছে ওরা।

ওরা উঠে পড়ার আগে, দু'জন লোক চড়া গলায় কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

'আরে, ওরা হেঞ্চার্ডের নাম বলাবলি করল শুনেছ?' বলল মেয়ে। 'আমাদের আত্মীয়র নাম!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' জানাল মা।

'যাব? গিয়ে জিজ্ঞেস করব তার কথা?'

'না, না, এখন না। কে জানে সে ভবঘুরে কেন্দ্রে কিংবা জেলখানায় আছে কিনা।'

'হায় খোদা, তুমি এসব কথা ভাবছ কেন, মা?'

'বললাম আরকি কথার কথা। আমাদের আগে খোঁজখবর করে জেনে নেয়া উচিত।'

ক্যাস্টারব্রিজের সমস্ত প্রদীপ জ্বেলে দেয়া হয়েছে, এসময় দুই মহিলা প্রবেশ করল শহরে। তারা শুনতে পেল শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাজনা বাজছে। গির্জার সামনে খোলামেলা এক জায়গা বেছে নিয়ে পাঁউরুটি হাতে দাঁড়িয়ে এক

মহিলা। খানিকটা করে রুটি ছিঁড়ে নিয়ে, তাকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকেদের স্বাদ পরখ করতে দিচ্ছে সে। ব্যাপারটা স্পষ্টতই গোলমেলে ঠেকল আগন্তুকদের চোখে। তবে পাঁউরুটি দেখে খিদে চেগিয়ে উঠল মিসেস হেঞ্চার্ড-নিউসনের। মহিলার কাছে সে জানতে চাইল কাছে পিঠে রুটি বিক্রেতার দোকান কোন্‌টা।

'এখন ক্যাস্টারব্রিজে ভাল রুটি পাওয়া যাবে না,' ওদেরকে দোকান দেখিয়ে দিয়ে বলল মহিলা। 'ওরা যতই বাজনা বাজিয়ে আমোদ-ফুর্তি করুক আর ভাল ভাল খাবার খাক না কেন–' রাস্তার ওমাথার উদ্দেশে হাত নেড়ে বলল। আলোকিত এক দালানের সামনে ব্যান্ড পার্টি দেখা গেল। '–আমরা রুটি খেতে পাচ্ছি না। ক্যাস্টারব্রিজে এখন ভাল বীয়ার পেতে পারো কিন্তু ভাল রুটি পাবে না।'

'তার কারণ?' মিসেস হেঞ্চার্ডের প্রশ্ন।

'শস্য-ব্যবসায়ী–আমাদের মিলার আর বেকাররা যার সাথে কারবার করে সে লোক ওদের কাছে খারাপ গম বিক্রি করেছে। গম যে খারাপ ওরা জানত না, মানে এখন তাই বলছে আরকি। জানাজানি হলো যখন আটার তাল চুলোর ওপর ছোটাছুটি শুরু করল। পাঁউরুটি হলো চ্যাপ্টা, মোটা আর ভেতরটা ভেজা-ভেজা। ক্যাস্টারব্রিজে এ ধরনের রুটি আগে কখনও দেখিনি। তবে তোমরা তো বিদেশী মানুষ, তোমাদের এসব জানার কথা নয়।'

'ঠিকই বলেছ,' এলিজাবেথের মা লাজুক কণ্ঠে বলল।

মেয়েকে নিয়ে আলগোছে সরে পড়ল সে, লোকের চোখে পড়তে চায় না। বেকারের দোকান থেকে গোটা দুই বিস্কুট কিনে পা চালাল যেখানে বাজনা বাজছে।

কিংস আর্মস হোটেলের সামনে শহরের ব্যান্ড পার্টি অনুষ্ঠান করছে। ক্যাস্টারব্রিজের সেরা হোটেল এটি। রাস্তার অপর পাশ থেকে মেইন রুমে কি হচ্ছে না হচ্ছে পরিষ্কার চোখে পড়ে। এজন্যে মানুষের বেশ বড়সড় একটি জটলা জমে গেছে ওখানে।

মিসেস হেঞ্চার্ড মনস্থির করল, মি. হেঞ্চার্ড সম্পর্কে এখান থেকে কিছু খবর জানার চেষ্টা করবে। বুঝে নেবে শহরে তার অবস্থান কোন্ পর্যায়ে। 'কাজটা তুই কর, এলিজাবেথ-জেন। আমি ভয়ানক ক্লান্ত।'

মার নির্দেশ মেনে ভিড়ের মাঝে মিশে গেল মেয়ে।

'কি হচ্ছে এখানে?' এক বুড়োকে বেছে নিল ও।

'তুমি নিশ্চয়ই নতুন এসেছ শহরে,' ওপাশের জানালা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল বুড়ো। 'শহরের হোমরা-চোমরাদের সম্মানে গণ দাওয়াতের আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ লোকেদের যেহেতু ডাকা হয়নি, ওরা জানালা খুলে রাখে যাতে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি। ওই যে উনি মি. হেঞ্চার্ড, শহরের মেয়র, টেবিলের শেষ মাথায় এদিকে মুখ করে বসে; আর ডানে-বাঁয়ে যাদের দেখছ তারা কাউন্সিলর···হাহ, এদের অনেকেরই জীবনের শুরুটা ছিল আমারই মত!'

'হেঞ্চার্ড!' এলিজাবেথ রীতিমত বিস্মিত। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে গেল আরও

ভাল করে দেখার জন্যে।

ওদিকে মেয়ের মার কানেও ইতোমধ্যে 'মি. হেঞ্চার্ড, মেয়র' একথাগুলো চলে এসেছে। আগ্রহী হয়ে উঠল সে। চটপট ধাপ ভেঙে মেয়ের পাশে উঠে এল মহিলা।

সম্মানের আসনে বসে রয়েছে সুসান হেঞ্চার্ডের স্বামী, পরিপক্ব-বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক। পুরানো ধাঁচের ইভনিংস্যুট, কুঁচিদার শার্ট, অলঙ্কৃত স্টাড ও ভারী এক সোনার চেইন তার দেহে শোভা পাচ্ছে। তার ডানপাশে তিনটে গেলাস; কিন্তু সুসান অবাক হয়ে আবিষ্কার করল ওয়াইনের গেলাস দুটো শূন্য, এবং তৃতীয়টির অর্ধেকখানি পানি ভর্তি।

সময় এক জাদুকর বিশেষ, ভাবল সুসান–কতটাই না বদলে দিয়েছে তার করডুরয় জ্যাকেট, ওয়েস্টকোট ও ব্রীচেস পরা সেদিনের সেই তরুণ স্বামীটিকে। অতীতে ফিরে গিয়েছিল, ভাবছিল স্বামীর কথা, মেয়ে গা স্পর্শ করতে তবে হুঁশ ফিরল।

'মা, দেখলে তাঁকে?' মেয়ে জানতে চাইল ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ত্বরিত জবাব দিল মা। 'দেখেছি, আর প্রয়োজন নেই! আমি এখন যেতে চাই–মরতে!'

'কি বলছ, মা?' মেয়ে ফিসফিস করে বলল। 'উনি আমাদের আত্মীয় বলে স্বীকার করবেন না ভাবছ? আমার তো ওঁকে দেখে যথেষ্ট উদারমনের মানুষ মনে হলো। হীরের স্টাডগুলো কিরকম ঝকমক করছে দেখেছ? আর তুমি কিনা বলছিলে এ লোক জেলে কিংবা ভবঘুরে কেন্দ্রে থাকতে পারে। ঠিক উল্টো হলো! তুমি লোকটাকে এত ভয় পাচ্ছ কেন, মা? আমার তো একটুও ভয় করছে না। আমি দেখা করব ওঁর সাথে। দেখি উনি কি বলেন, আমাদেরকে আত্মীয় মানেন কিনা।'

'কি করবি সে তুই জানিস। আমার খুব দুর্বল লাগছে।'

'এত কষ্ট করে এত দূর আসার পর এসব কথা বোলো না তো, মা। তুমি ওদিকে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও, আমি দেখি আরও কিছু জানা যায় কিনা।' মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল ভেতরের দৃশ্য দেখার উদ্দেশ্যে। 'মি. হেঞ্চার্ডের ওয়াইনের গেলাসগুলো খালি থাকছে কেন?' বুড়ো তখনও রয়েছে ওখানে, তাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'ও, উনি মদ স্পর্শ করেন না জানো না? এ ব্যাপারে খুব কড়া। যদ্দূর শুনেছি, বহু বছর আগে নাকি মদ পান না করার শপথ নিয়েছিলেন, সেটা এখনও রক্ষা করে চলেছেন। তাই কেউ ওঁকে মদ পানের জন্যে চাপাচাপি করে না। শপথ পূরণ হতে আরও দু'বছর নাকি বাকি। তবে শপথটা কিসের কেউ জানে না। উনি নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক লোক।'

'ওঁর স্ত্রী কবে মারা গেছেন?' এলিজাবেথ কৌতূহলী হয়।

'আমি কোনদিন দেখিনি। ক্যাস্টারব্রিজে আসার আগের ঘটনা ওটা। তবে এটা জানি উনি মদ খান না এবং তাঁর কোন কর্মচারী মাতাল হয়ে পড়লে ভয়ানক খেপে যান।'

'ওঁর অনেক কর্মচারী বুঝি?'

'অনেক! টাউন কাউন্সিলের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি উনি, আশপাশের দু'দশটা শহরের মাথা। যে কোন ধরনের শস্য বেচাকেনার বড়সড় কারবার যখনই হবে, হেঞ্চার্ড তাতে থাকবেনই থাকবেন। শূন্য হাতে এসেছিলেন এশহরে, আর আজ তিনি কোথায় উঠে গেছেন। এবছর অবশ্য পচা গম চালান দিয়ে বদনাম কামিয়েছেন। তাঁর হয়ে এত বছর কাজ করছি, কখনও বিনা দোষে বকাঝকা করেননি, তারপরও বলছি এবারের মত এত বিস্বাদ রুটি আমার জীবনে খাইনি।'

ব্যান্ডপার্টি নতুন সুর তুলেছে, বাজনা থামার আগেই ডিনার পর্ব সারা হলো। এখন বক্তাদের বক্তৃতা করার পালা। শান্ত-সুন্দর সন্ধ্যা, জানালা সব কটা তখনও খোলা, ফলে বক্তাদের কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। একসময় সবার গলা ছাপিয়ে কানে এল হেঞ্চার্ডের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। খড়ের কারবার করতে গিয়ে কিভাবে এক বাটপাড়কে উল্টো বোকা বানিয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী ফেঁদেছে সে।

'হা-হা-হা!' গল্প শেষে শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়ল। নতুন এক কণ্ঠস্বর শোনা না যাওয়া পর্যন্ত তাদের হাসি থামল না।

'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু পচা রুটির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জানতে পারি কি?'

টেবিলের ও মাথা থেকে প্রশ্নটা এসেছে। ছোট ব্যবসায়ীদের একটা দল ওখানে বসা। দেখে মনে হয় অন্যদের চাইতে এদের সামাজিক অবস্থান খানিকটা খাটো। স্বাধীন মতামত প্রকাশে এরা পিছপা নয় বোঝা গেল, এবং টেবিলের এমাথায় বসা পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে এদের যে মতপার্থক্য রয়েছে তাও পরিষ্কার হলো।

পচা রুটির কথা শুনে উৎসাহিত হলো বাইরে সমবেত জনতা। তারাও প্রশ্ন তুলল: 'এই যে, মেয়র, পচা রুটির ব্যাপারে কি বলেন আপনি?' এবার আরেকজন ফোড়ন-কাটল: 'রুটির গল্পটা বললে ভাল হত, স্যার!'

গোলমালের শব্দে এমন বাধাই পড়ল, মেয়র বাধ্য হলো জবাব দিতে। 'স্বীকার করছি এবারের গমটা খারাপ ছিল,' বলল। 'কিন্তু কেনার সময় টের পাইনি, বেকাররা যেমন আমার কাছ থেকে না জেনেই কিনেছে।'

'অথচ গরীব লোকেরা অসুখ হবে জেনেও রুটি কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছে!' সেই কঠোর কণ্ঠটি আবার ভেসে এল ক্রুদ্ধ জনতার ভিড় থেকে।

মুখ আঁধার হলো হেঞ্চার্ডের। মেজাজ ভেতর ভেতর গরম হয়ে উঠছে–প্রায় বিশ বছর আগে কড়া মদ পান করে এভাবেই মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল তার, যার ফলে বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিল স্ত্রীকে।

'বড় ব্যবসায় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে,' সাফাই গাইল সে। 'ফসল কাটার সময় আবহাওয়া কেমন জঘন্য ছিল সবাই জানো। এবারে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। ব্যবসা বড় হয়েছে, একা সামলাতে পারছি না। তাই শস্য বিভাগের জন্যে একজন সুদক্ষ ম্যানেজার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। ভাল লোক পেয়ে গেলে এ ধরনের ভুল আর ঘটবে না।'

'কিন্তু পচা গম নিয়ে আমরা কি করব?' সেই একই কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল।

লোকটি সম্ভবত রুটি ব্যবসায়ী। 'ওগুলো পাল্টে ভাল গম দেবেন?'

হেঞ্চার্ডের মুখের ভাব আরও কঠোর হলো। সরাসরি জবাব না দিয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'পচা গম ভাল করার কায়দা কেউ শিখিয়ে দিক, খুশি মনে ফেরত নেব।'

জনৈক আগন্তুক ক'মিনিট আগে জনতার ভিড়ে যোগ দিয়েছে। মেয়রের কথা শুনে মুচকি হাসল। চোখের পলকে একখানা নোটবই বের করে তাতে কিছু কথা টুকে নিল। এবার পাতাটা ছিঁড়ে, ভাঁজ করে হোটেলের দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল।

'মেয়রকে এখুনি এটা দেবে,' দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এক হোটেল কর্মচারীর উদ্দেশে বলল, তার দিকে বাড়িয়ে দিল কাগজটা। '...আর কম খরচে ভাল হোটেল কোথায় পাব বলতে পারো?'

থ্রী মেরিনার্স হোটেলের অবস্থান জানানো হলে দ্রুতগতিতে সেদিকে পা চালাল ও। তার ভাবখানা দেখে মনে হলো, চিরকুটটার ফলাফলের চাইতে কোথায় থাকবে সেটি যেন বেশি জরুরী।

এলিজাবেথ-জেন প্রায় প্রথম থেকেই যুবকটিকে লক্ষ করছিল। সুদর্শন, হালকা-পাতলা গড়নের ছেলেটির উচ্চারণে স্কটিশ টান। জানালা পথে চোখ রাখতে দেখতে পেল চিরকুটটা পৌঁছে দেয়া হলো মেয়রের কাছে। হেঞ্চার্ড দায়সারাভাবে ওটা লক্ষ করে, এক হাতে ভাঁজ খুলে এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিল। অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তার, এবার মনোযোগ দিয়ে আরেকবার পড়ল কাগজটা।

বক্তৃতার পালা ফুরালে গান-বাজনা শুরু হলো। পচা গমের দুঃখ ভুলে গেল সবাই।

ঘড়িতে নটা বাজল। এলিজাবেথ-জেন মার দিকে ফিরে চাইল। 'রাত হয়ে যাচ্ছে, থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়।' মা জবাব না দেয়াতে মেয়ের মনে পড়ল স্কটিশ যুবকের কথা, থ্রী মেরিনার্স হোটেলের নাম বলা হয়েছিল তাকে।

মাকে ওটার কথা বলতে সে দ্বিমত করল না। রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। হোটেলে পৌঁছনোর পর বাড়ির ওপরতলায় ছোট একখানা কামরা দেখানো হলো ওদের। সেই স্কটিশ যুবক, যে ওদের মিনিট বিশেক আগে এসেছে, পাশের ঘরটা পেয়েছে।

ওদিকে চিরকুটখানা মেয়রের সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছে। কিংস আর্মস হোটেল ত্যাগ করল সে। বাইরে হোটেলের সেই কর্মচারীটি ছিল। কার কাছ থেকে চিরকুট পেয়ে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে জানতে চাইল হেঞ্চার্ড।

'এক কমবয়সী লোক, স্যার, আগে কখনও দেখিনি; জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেই লিখেছে।'

'এই হোটেলে উঠেছে?'

'না, স্যার। খুব সম্ভব থ্রী মেরিনার্সে গেছে।'

মেয়র ডাইনিংরুমে ফিরে এসে হ্যাট-ওভারকোট তুলে নিল। অতিথিরা বিদায় নিচ্ছে যে যার মত, তার দিকে মন নেই কারও। এবার থ্রী মেরিনার্সের উদ্দেশে পা

বাড়াল সে। ওখানে তাকে চিনিয়ে দেয়া হলো স্কটিশ যুবকের কামরা।

সংলগ্ন কামরার দুই নারী তখুনি জেনে গেল মেয়রের উপস্থিতির কথা। দুটো কামরার মাঝে পুরানো, পাতলা দেয়াল, ফলে কথা-বার্তা এঘরেরটা ওঘরে স্পষ্টই শোনা যায়।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব বলে এলাম,' বলল মেয়র। 'আগে বলো, এটা কি তোমার লেখা?' কাগজের খসখস শব্দ শোনা গেল পরক্ষণে।

'হ্যাঁ, আমার।'

'তারমানে আমার বিজ্ঞাপনের জবাবে এটা লিখেছ তুমি?'

'না তো,' স্কটিশ যুবক খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

'তুমি নিশ্চয়ই সেই লোক,' কথার খেই ধরল হেঞ্চার্ড, 'যার আমার সাথে দেখা করার কথা? জণ্ডয়া-জিপ-জপ-নামটা কি যেন?'

'ভুল বললেন,' বলল যুবক। 'আমার নাম ডোনাল্ড ফারফ্রে। আমি শস্য ব্যবসার সাথে জড়িত বটে-তবে কোন বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েনি কিংবা কারও সাথে দেখা করারও কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমি যাচ্ছি ব্রিস্টলে-সেখান থেকে ভাগ্যান্বেষণে যাব দুনিয়ার অপর প্রান্তে, পশ্চিমের গম প্রধান জেলাগুলোয়!'

'আমেরিকায়-ভাল, ভাল,' হতাশা ফুটল মেয়রের কণ্ঠে। 'যাকগে, তুমি চিরকুটে যে কথাগুলো লিখেছ সেজন্যে আমি কৃতার্থ বোধ করছি।'

'ও কিছু না, স্যার।'

'আমার কাছে কিন্তু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গমের এবারের চালানটা ভয়ানক ভোগাল আমাকে। এখনও প্রচুর গম রয়ে গেছে আমার কাছে। তোমার কায়দা কাজে লেগে গেলে বড় উপকার হয়।'

'টিক' করে লেগে গেল তালা, তারপর খসখস শব্দ; এবার গমের ওজন, শুষ্ক ও শীতলকরণ প্রক্রিয়া এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল। একসময় ক্ষণিক বিরতির পর স্কটিশ যুবক বলল, 'নিন, চেখে দেখুন।'

'স্বাদ তো অনেকটাই ফিরেছে-'

'পুরোপুরি কখনোই ফেরানো যাবে না,' বলল যুবক। 'তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে না? কায়দাটা এটাই, স্যার, এতে আপনার কাজ হলে আমি খুশি হব।'

'আমার কথাটা শোনো,' বলল হেঞ্চার্ড। 'আমি জানোই তো শস্য আর খড়ের কারবারী। তবে যৌবনে আমি হে-কাটার হিসেবে কাজ করেছিলাম, এবং খড়ের ব্যাপারটা আমি বুঝি ভাল। এখন অবশ্য শস্যের ব্যবসাটাই বেশি চালু আমার। তুমি রাজি হলে তোমাকে শস্য বিভাগের ম্যানেজার করে দেব, বেতন ছাড়াও কমিশন পাবে।' ডোনাল্ড ফারফ্রে সবিনয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করল, কেননা পরদিন ভোরে সে চলে যাচ্ছে।

হেঞ্চার্ড আবারও চাপ দিল ওকে, তারপর চিন্তামগ্নচিত্তে বলল, 'প্রায় দু'বছর ধরে তোমার মত একজনকে খুঁজছি আমি। তুমি কাজটা নাও-তোমার কোন শর্ত থাকলে বলে ফেলো। আমি খুশি মনে মেনে নেব, তর্ক করব না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে ফারফ্রে, ভাইয়ের মত মনে হচ্ছে!'

দু'মুহূর্তের নীরবতার পর জবাব এল, 'আমি এটা আশা করিনি! একেই বোধহয় ভাগ্য বলে। বেশ তো, আমেরিকা না হয় না-ই বা গেলাম। আমি চাকরিটা নিচ্ছি।'

জোরাল করমর্দনের পর, লোক দু'জন একসঙ্গে কামরা ত্যাগ করল।

নীরবতা নেমে এলে এলিজাবেথ-জেন মার দিকে চাইল। 'কিছু ভাবছ, মা?' মৃদু স্বরে শুধাল।

'হ্যাঁ, মি. হেঞ্চার্ড খুব তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে পছন্দ করে ফেলল, সে কথাই ভাবছিলাম। লোকটা চিরকালই এরকম। অচেনা মানুষকে যদি এত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে তবে নিজের আত্মীয়দেরও নিশ্চয়ই করবে।'

তিন

বেচারী সুসান হেঞ্চার্ড উদ্বিগ্ন একটি রাত কাটাল, ইতিকর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারছে না সে। আসল স্বামীর খোঁজে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। অথচএলিজাবেথ-জেনকে প্রতিপালনের দায়িত্বও তার একার পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। একে টাকা-পয়সার টানাটানি, তার ওপর ভগ্নস্বাস্থ্য–মহিলার ভয়ানক কাহিল লাগে আজকাল।

পরদিন সকালে মেয়েকে হেঞ্চার্ডের কাছে একটা বার্তা দিয়ে পাঠাবে, সিদ্ধান্ত নিল অবশেষে। হেঞ্চার্ডকে জানানো হবে, তার আত্মীয় সুসান, এক নাবিকের বিধবা, এ শহরে এসেছে; এখন চেনা না চেনা ওই লোকের ব্যাপার।

'যদি না চেনে,' দরজার কাছে দাঁড়ানো এলিজাবেথকে বলে দিল, 'তাহলে বলবি আমরা যেভাবে এসেছিলাম তেমনি নীরবে ক্যাস্টারব্রিজ ছেড়ে চলে যাব···আমার মন বলছে না চিনলেই ভাল হয়, কত বছর দেখা নেই, কত বদলে গেছি আমরা!'

'আর যদি চিনতে পারে?' মেয়ে প্রশ্ন করে।

'তাহলে,' সতর্কতা ফোটে মিসেস হেঞ্চার্ডের গলার সুরে, 'বলিস আমাকে যেন একটা চিঠি লিখে জানায় সে আমাদের সাথে দেখা করতে চায়–কিংবা শুধু আমার সাথে।'

সিঁড়ির উদ্দেশে ক'পা এগিয়ে গেল এলিজাবেথ।

'আর এটাও বলিস,' মা বলে চলে, 'তার ওপর আমার কোন দাবি নেই। সে উন্নতি করেছে আমি এতেই খুশি। তার সুখী, দীর্ঘ জীবন কামনা করি আমি।' অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগে ভরপুর হৃদয়ে, ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবগত মেয়েকে একাজে পাঠাল সে।

কর্ন স্ট্রীটে হেঞ্চার্ডের বাড়ি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না। এলিজাবেথকে জানানো হলো বাসায় নেই হেঞ্চার্ড, বাসার পেছনে কর্ন-ইয়ার্ডে রয়েছে।

ইতস্তত ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে এলিজাবেথ, অস্বস্তি বোধ করছে এই ভেবে, গরীব আত্মীয় তার ধনী আত্মীয়কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত 'অফিস' লেখা দরজায় টোকা দেয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারল ও।

'ভেতরে আসুন,' আদেশ এল।

হাতল ঘুরাতে এলিজাবেথ দেখতে পেল, শস্য ব্যবসায়ীকে নয়, স্কটিশ যুবক মি. ফারফ্রেকে। ক'খানা বস্তা রাখা এক টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে লোকটি।

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?' বলল যুবক, নতুন পদে স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

মি. হেঞ্চার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়, অনুচ্চ স্বরে জানাল এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন। উনি ব্যস্ত আছেন,' বলে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল যুবক।

এলিজাবেথ বসে রয়েছে, এক লোক এসময় ঘরে এসে ঢুকল। হেঞ্চার্ড ভেতরের দরজা মেলে ধরেছিল এলিজাবেথের জন্যে, কিন্তু লোকটি এলিজাবেথকে লক্ষ না করে তার বদলে নিজেই ঢুকে পড়ল। হেঞ্চার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলা তার কথাগুলো কানে এল এলিজাবেথের: 'জশুয়া জপ, স্যার–নতুন ম্যানেজার।'

'নতুন ম্যানেজার! কেন, সে তো অফিস করছে,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড।

'অফিস করছে!' লোকটি যারপরনাই বিস্মিত।

'আমি বলেছিলাম বৃহস্পতিবার আসতে,' বলল হেঞ্চার্ড। 'আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে পারেননি, আমি অন্য লোক নিয়ে ফেলেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনিই সেই লোক। আমার দেরি করার মত উপায় ছিল না।'

'আপনি বলেছিলেন বৃহস্পতি নয়তো শনি, স্যার,' একখানা চিঠি বের করে বলল লোকটি। 'বলেছিলেন শনিবার কাজে জয়েন করতে পারি।'

আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া এখন আর কিই বা করার আছে। অগত্যা লোকটি ক্ষুণ্ন মনে বেরিয়ে এল। তার মুখের চেহারায় অব্যক্ত ক্রোধ ও হতাশার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেল এলিজাবেথ।

সে নিজে এবার প্রবেশ করল অফিস ঘরটিতে, দাঁড়াল গিয়ে হেঞ্চার্ডের সামনে।

'কি ব্যাপার বলুন তো?' সহৃদয় কণ্ঠে শুধাল হেঞ্চার্ড।

'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল–ব্যবসা সংক্রান্ত নয়।'

'বলুন?' চিন্তিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল হেঞ্চার্ড।

মার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ, লোকটি তার সাথে দেখা করতে চায় কিনা।

মুখের চেহারার রং পাল্টে গেল মেয়রের। 'কি–সুসান–এখনও বেঁচে আছে?' রীতিমত কষ্ট হলো তার শব্দগুলো উচ্চারণ করতে।

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি তার মেয়ে?'

'জ্বী, স্যার–একমাত্র মেয়ে।'

'কি–কি নাম তোমার?'

'এলিজাবেথ-জেন, স্যার।'

'নিউসন?'

'এলিজাবেথ-জেন নিউসন।'

"অদ্ভুত কথা শোনালে,' বলল হেঞ্চার্ড। 'আমার বাসায় চলো?'

এলিজাবেথ কিছুটা অবাক হলেও আপত্তি করল না, অফিস ত্যাগ করে লোকটির সঙ্গে তার বাসায় গেল।

'বসো–এলিজাবেথ-জেন–বসো,' ওর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁপে উঠল লোকটির গলা। 'তোমার মা তাহলে ভাল আছে?'

'কাহিল হয়ে পড়েছে–কম দূর তো না।'

'নাবিকের বিধবা–কবে মারা গেছেন উনি?'

'গত বসন্তে বাবা নিখোঁজ হন।'

আঘাত পেল হেঞ্চার্ড 'বাবা' শব্দটা শুনে। 'তোমরা কি বিদেশ থেকে এসেছ?'

'জ্বী না। ইংল্যান্ডে বেশ ক'বছর ধরে আছি। কানাডা থেকে যখন আসি তখন আমার বারো বছর বয়স।'

'ও, আচ্ছা।' কথোপকথনের মাধ্যমে স্ত্রী-সন্তানের এতগুলো বছর কিভাবে কেটেছে জেনে নিল হেঞ্চার্ড। 'তোমার মা এখন কোথায় আছে?'

'থ্রী মেরিনার্সে।'

'একটা চিরকুট লিখে দেব নিয়ে যেয়ো। আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। ওর স্বামী বোধকরি টাকা-পয়সা তেমন রেখে যেতে পারেননি?' এলিজাবেথের পোশাক-আশাকের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল।

'বেশি না,' জানাল এলিজাবেথ। সে খুশি হলো হেঞ্চার্ড নিজে থেকেই বিষয়টি বুঝে নিয়েছে বলে।

টেবিলে বসে সুসানের উদ্দেশে কয়েক লাইন লিখে ফেলল হেঞ্চার্ড। এবার ওয়ালেট থেকে একখানা পাঁচ পাউন্ডের নোট বার করে, চিঠির সাথে ঢুকিয়ে দিল খামের ভেতর। তারপর কি ভেবে ওর সাথে আরও পাঁচটা শিলিংও ভরে দিল। খামটা সযত্নে এঁটে দিয়ে, ঠিকানা লিখল: 'মিসেস নিউসন, থ্রী মেরিনার্স সরাইখানা,' এবার তুলে দিল এলিজাবেথের হাতে।

'এটা নিয়ে যাও,' বলল হেঞ্চার্ড। 'তুমি আসাতে আমি খুশি হয়েছি, এলিজাবেথ-জেন–খুব খুশি হয়েছি। অনেক কথা বলার আছে তোমার সাথে। তবে এখন নয়, পরে।' বিদায় দেয়ার আগে মেয়েটির হাত ধরে রইল সে আন্তরিকতার সঙ্গে।

মা যখন চিঠিখানা খুলল এলিজাবেথের পিঠ তখন তার দিকে ফেরানো। চিঠিতে লেখা রয়েছে:

'আজ রাত আটটায় পারলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। বাডমাউথ রোডে প্রাচীন রোমান ধ্বংসস্তূপ রয়েছে, সেখানে। সহজেই খুঁজে পাবে জায়গাটা। তোমার খবর পেয়ে চমকে গেছিলাম। মেয়েটাকে দেখে মনে হলো কিছুই জানে না। আগে দেখা হোক, তারপর দু'জন মিলে ঠিক করব কি করা যায়।

ম.হ।'

পাঁচ গিনির বিষয়ে কিছুই বলেনি সে, তবে টাকার পরিমাণটা অর্থপূর্ণ। মহিলা ঠিকই বুঝতে পারল, হেঞ্চার্ড তাকে আবার কিনে নিল। অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করে চলল সে, মেয়েকে জানাল মি. হেঞ্চার্ড তাকে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু সাক্ষাৎ পর্ব লোকটির বাড়িতে নয়, অন্য কোথাও হবে একথা ভাঙল না, এবং চিঠিখানাও পড়তে দিল না এলিজাবেথকে।

ক্যাস্টারব্রিজ কোন একসময় রোমান শহর ছিল। যে ধ্বংসস্তূপটির কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছে হেঞ্চার্ড, সেখানে রাতের বেলায় যায় না কেউ বড় একটা। কেননা, আশপাশের পরিবেশটা গা ছমছমে। আর নির্জন বলেই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছে হেঞ্চার্ড। শহরের মেয়র হিসেবে তার একটা সম্মান রয়েছে, হুট করে একজন অচেনা মহিলাকে বাসায় আসতে বলতে পারে না সে।

আটটার আগ দিয়ে পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপটির উদ্দেশে পা বাড়াল সে, ঢুকল দক্ষিণ দিক থেকে। ক'মুহূর্ত বাদেই উত্তর দিক থেকে সন্তর্পণে আসতে দেখল এক নারীমূর্তিকে। ঠিক মাঝখানটায় মিলিত হলো ওরা। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই–এরকম পরিস্থিতিতে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না আসলে। হতভাগিনী সুসান ঢলে পড়ল হেঞ্চার্ডের বুকে। তাকে জড়িয়ে ধরে থাকল হেঞ্চার্ড।

'আমি আর মদ খাই না,' অনুচ্চ, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল লোকটি। 'জানো, সুসান?—আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি—সে রাতের পর আর এক ফোঁটাও মুখে দিইনি।' এভাবেই কথোপকথন আরম্ভ করল সে।

মহিলা বুঝতে পেরে মাথা নোয়াল অনুভব করল হেঞ্চার্ড। দু'এক মিনিট বিরতি নিয়ে ফের বলে চলল সে, 'যদি জানতাম তুমি বেঁচে আছ, সুসান! অনেক চেষ্টা করেছি তোমার খোঁজ বের করার জন্যে। এখানে-সেখানে চলে গেছি, বিজ্ঞাপন দিয়েছি—শেষে বদ্ধমূল ধারণা হলো, যাত্রাপথে ওই লোকের সাথে সাগরে ডুবে মারা গেছ। তুমি এতদিন চুপ করে ছিলে কেন, সুসান? কেন?'

'ও, মাইকেল! ওই মানুষটার জন্যে–আর কি কারণ থাকতে পারে বলো? আমি তার প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলাম। লোকটা তো কম করেনি আমাদের জন্যে। ও মারা যাওয়াতেই কেবল ওর বিধবা হিসেবে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি, তোমার ওপর কোন দাবি নিয়ে আসিনি। ও বেঁচে থাকলে আসতাম না—কখনোই না! এ ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ রেখো না।'

'এজন্যেই তো তুমি একজন নিষ্পাপ নারী। ঠিকই করেছিলে তুমি। কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো? একসাথে থাকার ব্যাপারটা কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়? এলিজাবেথ-জেনকে আমরা কি বলব? আসল ঘটনা তো ওকে বলতে পারছি না, ও আমাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করবে–আমি সইতে পারব না।'

'সেজন্যেই আজ অবধি তোমার কথা ওকে কিছুই জানাইনি। আমিও সেটা সহ্য করতে পারতাম না।'

'একটা কিছু উপায় আমাদের ভেবে বের করতে হবে। শুনেছ নিশ্চয়ই, এখানে আমার মস্ত কারবার—আমি এখানকার মেয়র এবং চার্চওয়ার্ডেন, আরও কি কি আল্লাই জানে!'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল সুসান।

'এসব তো আছেই, সে সঙ্গে লজ্জাজনক ব্যাপারটা মেয়ে জেনে ফেলতে পারে সেই ভয়··· ফলে, আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তোমাদেরকে কিভাবে যে স্ত্রী আর কন্যা হিসেবে ঘরে তুলে নেব বুঝে উঠতে পারছি না।'

'তুমি ভেবো না, আমরা শীঘ্রিই চলে যাব। এসেছিলাম শুধু তোমাকে একনজর–'

'না, না, সুসান। তুমি যাবে না। আমি ওকথা বলতে চাইনি!' বলল হেঞ্চার্ড। 'একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে, দেখো তো চলে কিনা: তুমি আর এলিজাবেথ শহরে একটা কটেজ ভাড়া নেবে। তুমি নিউসনের বিধবা স্ত্রী, আর ও তোমাদের মেয়ে। তোমার সাথে আমার দেখা হবে, ভাল লাগবে, তারপর বিয়েও করে ফেলব। সৎ মেয়ে হিসেবে আমার বাসায় আসবে এলিজাবেথ-জেন। আমাদের গোমর আমাদেরই রইল, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে আমি এক বাড়িতে বাস করার সুযোগ পেলাম।'

'তুমি যেমন যেমন বলবে তেমনই হবে, মাইকেল,' ক্ষীণ স্বরে বলল সুসান। 'আমি এখানে এসেছি এলিজাবেথের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।' তারপর সামান্য বিরতি নিয়ে আরও বলল, 'তোমার বুদ্ধিটা মনে ধরেছে আমার। এত বছর পর এটাই মনে হচ্ছে সঠিক কাজ হবে। আমি যাই এখন, মেয়েকে গিয়ে বলি মি. হেঞ্চার্ড আমাদের এ শহরে থেকে যেতে বলেছেন।'

'চলো, খানিক দূর এগিয়ে দিই তোমাকে।'

'না, না, কোন ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই!' শঙ্কা ফুটল ওর স্ত্রীর কণ্ঠে। 'আমি একাই যেতে পারব। বেশি রাত তো হয়নি, ঠিক রাস্তা চিনে নেব।'

'ঠিক আছে,' বলল হেঞ্চার্ড। 'কিন্তু একটা কথা শুধু বলে যাও। তুমি আমাকে মন থেকে মাফ করেছ তো, সুসান?'

বিড়বিড় করে কিসব আওড়াল মহিলা, হেঞ্চার্ডের বোধগম্য হলো না জবাবটা।

'আচ্ছা, যাকগে,' বলল হেঞ্চার্ড। 'আগামীতে আমার ব্যবহার কেমন হয় দেখে তারপর না হয় বিচার কোরো। এখন এসো!'

সুসান রওনা দেয়ার পর নিজের পথ ধরল মেয়র। বাসায় পৌঁছে পেছন দিকে চাইতে দেখে অফিস ঘরে আলো জ্বলছে। ডোনাল্ড ফারফ্রে বই-পত্র নিয়ে তখনও ব্যস্ত। অফিসে গিয়ে ঢুকল মেয়র।

'আজ আর কোন কাজ নয়,' বলে অ্যাকাউন্ট বইগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে বন্ধ করে দিল হেঞ্চার্ড। 'কাল বিস্তর সময় পাবে। ভেতরে চলো, কিছু খেয়ে নেবে আমার সাথে বসে।'

অফিসে তালা দিয়ে, সঙ্গীকে অনুসরণ করে তার বাড়িতে প্রবেশ করল নবাগত যুবক।

'আমাদের সম্পর্কটা যদিও ব্যবসায়িক,' বলল হেঞ্চার্ড। 'তারপরও প্রথম দিনের শেষেই তোমার সাথে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ফারফ্রে। অবশ্য আর কে-ই বা আছে আমার যার সাথে কথা বলা যায়?'

ফারফ্রে তাকে উৎসাহ দিল।

'আমাকে এখন যেমন দেখছ আগে এরকম ছিলাম না,' কথা শুরু করল হেঞ্চার্ড। তার ভারী, গম্ভীর কণ্ঠ ঈষৎ কেঁপে উঠল। এমনই এক পরিস্থিতিতে পড়েছে লোকটি, যে পরিস্থিতিতে মানুষ কখনও কখনও পুরানো বন্ধুর চাইতে নতুন বন্ধুর কাছে নিজেকে মেলে ধরতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। 'হে-মেকার হিসেবে জীবন শুরু করি আমি। বিয়ে করি আঠারো বছর বয়সে। তুমি জানতে আমি বিবাহিত?'

'শুনেছি আপনার স্ত্রী মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, লোকে সেটাই জানে। উনিশ বছর আগে নিজের দোষে স্ত্রীকে হারাই আমি। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল সব বলব তোমাকে।' মুহূর্তের বিরতি নিল হেঞ্চার্ড। টেবিলে কনুই রেখে একটা হাত রাখল কপালে। কলঙ্কিত অধ্যায়টি এবার সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুরু করল ও।

'উনিশ বছর ধরে শপথ রক্ষা করে চলেছি,' এই বলে শেষ করল। 'উঠে এসেছি আজকের পর্যায়ে।'

'অবিশ্বাস্য!'

'আর আজ এত বছর পর আমার স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, আজ সকালে–আজই সকালে। এখন কি করব আমি বলতে পারো?'

'তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে একসাথে বাস করা যায় না? ক্ষমা করে দিলেন একে অপরকে!'

'আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু, ফারফ্রে,' বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড, 'সুসানের প্রতি সুবিচার করতে গেলে যে অন্যায় করা হয় আরেকজন নিষ্পাপ মহিলার প্রতি।'

'সে কিরকম?'

'বলছি। জার্সিতে অনেক বছর ধরে কারবার করছি আমি। বিশেষ করে আলুর মৌসুমে। একবার ওখানে আছি এসময় অসুখে পড়ি। আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম এক মহিলাও সেখানে ওঠে। আমার অসুস্থতার সময় সে খুব সেবা-যত্ন করে। আমার মত মানুষের যদিও তা প্রাপ্য ছিল না। ও ভাল বংশের মেয়ে, শিক্ষিতা–বাবা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। আমার সাথে যখন পরিচয় হয় তখন ওর বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই, টাকা-পয়সারও টানাটানি। একই হোটেলে ছিলাম বলে দ্রুত ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। আমি চলে এলে ভয়ানক কলঙ্ক রটে আমাদের নামে, যার ফলে ওর ইজ্জত যায় ধুলোয় মিশে। আমার কারণে প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ওকে। এজন্যে একটার পর একটা চিঠি লিখে ওকথা জানাতেও সে ভুল করেনি। আমিও অনুভব করি ওর কাছে আমি ঋণী। সুসানের যেহেতু দীর্ঘদিন কোন খোঁজ খবর ছিল না, তাই ওকে বলি ও চাইলে আমাকে বিয়ে করতে পারে–সুসান বেঁচে আছে সে ঝুঁকিটুকু যদি স্বীকার করে নেয়। ও সানন্দে রাজি হয় এবং শীঘ্রি আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম। ঠিক এমনি অবস্থায় সুসান এসে হাজির হলো। এখন যে কোন এক জনকে বঞ্চিত না করে উপায় নেই

বুঝতেই পারছ। আর আমার প্রথম দায়িত্ব সুসানের প্রতি–কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এ বিষয়ে। কাজেই দ্বিতীয় জনকেই আমার ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।'

'কি আর করবেন!' বলল যুবক। 'মহিলাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়া দরকার ওঁকে বিয়ে করতে পারছেন না আপনি। কেননা আপনার স্ত্রী ফিরে এসেছেন।'

'তাতে কাজ হবে না। একটা বড় অঙ্কের টাকা ওর হাতে তুলে দেব ভাবছি। তুমি কি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেবে? চিঠি লেখা আমার ভাল আসে না।'

'নিশ্চয়ই লিখব।'

এবার তার ঔরসজাত সন্তান এলিজাবেথের কথাও খুলে বলল হেঞ্চার্ড। মেয়েটি জানে না সে ওর বাবা, সেই নাবিকটিকেই ও বাবা মনে করে, এ-ও জানাল। হেঞ্চার্ড ও সুসান মেয়েকে অত বছর আগেকার গ্লানিকর বিষয়টি কোনমতেই জানাতে পারবে না। এ ব্যাপারে ফারফ্রের কি মত?

'আমি ওকে জানাতে পারি। আমার ধারণা ও আপনাদের দু'জনকেই ক্ষমা করে দেবে।'

'প্রশ্নই ওঠে না!' আঁতকে ওঠে হেঞ্চার্ড। 'আমি ওকে সত্যটা জানতে দেব না। ওর মা আর আমি আবার বিয়ে করব। এতে করে শুধু যে সন্তানের সম্মান রক্ষা হবে তা-ই নয়, এটাই সঠিক কাজ হবে। ধর্ম মতে বিয়ে না করলে সুসান আমার সাথে বাস করতে রাজি হবে না–এবং না হওয়াই উচিত।'

ফারফ্রে আর কথা বাড়াল না। জার্সির সেই মহিলার উদ্দেশে ভেবেচিন্তে একখানা চিঠি লিখে ফেলল। লেখা শেষ করে যুবকটি উঠে দাঁড়াতে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল হেঞ্চার্ড।

'মনটা এখন হালকা লাগছে, ফারফ্রে। দেখলে তো, ক্যাস্টারব্রিজের মেয়রের অনেক অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু মানুষটা সে সুখী না।'

'তাই তো দেখলাম। আপনার জন্যে আমার খারাপ লাগছে!' বলল ফারফ্রে। ও চলে গেলে চিঠিটা নকল করল হেঞ্চার্ড এবং ওটার সাথে একখানা চেক যোগ করল।

'এত সহজে কি পার পাওয়া যাবে?' আওড়াল আপন মনে।

তার ভাড়া করে দেয়া কটেজে মা-মেয়ে একটু থিতু হয়ে বসতেই দেখা করতে এল মাইকেল হেঞ্চার্ড। এলিজাবেথকে ওদের সম্পর্কের কথা যেমন যেমন বোঝানো হয়েছে সে তেমনটিই বুঝেছে–হেঞ্চার্ড ওর মায়ের আত্মীয়। হেঞ্চার্ড এতে খুশি হলেও সুসান বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এদিকে, ওর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করতে আসতে লাগল মেয়র।

এক বিকেলে এলিজাবেথ বাসায় নেই, এসময় হেঞ্চার্ড এসে হাজির। 'শুভ দিনটা কবে ঠিক করা যায়, সুসান?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করল।

ফিকে হাসল মহিলা। গোটা বিষয়টা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। মেয়েকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, তবে বলবে কিনা প্রায়ই ভেবেছে।

সুসানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিনের পর দিন পীড়াপীড়ি করে চলল হেঞ্চার্ড। 'মাইকেল,' অবশেষে একদিন বলে ফেলে সুসান, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে অযথা তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে, কাজের ক্ষতি হচ্ছে। আমার ভাল লাগছে না!' লোকটির

আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলায় মহিলা। হেঞ্চার্ড মান্যগণ্য, ধনী ব্যক্তি। এবার হেঞ্চার্ডের সরবরাহ করা আসবাবপত্রগুলো এক ঝলক দেখে নেয় সে। যেমন দামী, তেমনি সুদৃশ্য। কেমন জানি এক ধরনের শঙ্কা জাগে তার বুকে, অসুস্থ বোধ হয়।

গোটা শহর আসন্ন অনুষ্ঠানটি নিয়ে মুখরিত। শহরবাসী অবাক হয়ে ভাবে, এরকম এক গরীব, ভগ্নস্বাস্থ্য মহিলাকে কি দেখে পছন্দ করল তাদের বিত্তশালী মেয়র সাহেব। বিশেষ করে যে লোক কিনা ওদের জানা মতে সর্বদা নারীসঙ্গ পরিহার করে এসেছে।

বাইরে থেকে দেখে কারও বোঝার সাধ্য নেই কেন একাজ করতে যাচ্ছে মাইকেল হেঞ্চার্ড। আসলে এর তিনটে কারণ রয়েছে। সুসানের প্রতি করা অন্যায়ের প্রতিবিধান, মেয়ের জন্যে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং অতি সাধারণ এক নারীকে বিয়ে করে মানুষের চোখে নিজেকে খাটো করা। এভাবে অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।

জীবনে এই প্রথমবারের মত ক্যারিজে চাপল সুসান। ওকে আর এলিজাবেথকে বিয়ের দিন গির্জায় পৌঁছে দিতে এসেছে ওটা। নভেম্বরের ঠাণ্ডা, বৃষ্টিভেজা এক দিন ছিল সেটা। হাতে গোণা অল্প ক'জনই কেবল সাক্ষী থাকল মেয়রের দ্বিতীয় বিয়ের।

এত সুখ, এত সম্মান পাবে জীবনে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি সুসান। স্বামী তাকে খুশি করতে কী না করেছে। টাকা খরচ করেছে দু'হাতে। বিশাল বাড়িটির মস্ত মস্ত সব কামরা, প্রশস্ত বারান্দা যেন লক্ষই করল না নতুন বেগম সাহেবার আগমন–এতটাই নগণ্য, বেমানান সে এখানে।

এলিজাবেথ-জেনের জন্যে অবশ্য সময়টা দারুণ উত্তেজনাকর। আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ওর জীবনে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করল। যখন যা খুশি চাইলেই এখন পেয়ে যাচ্ছে। সৎ বাবার সঙ্গে হয়তো বাইরে গেছে, কোন একটা গয়না মনে ধরল। শুধু আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়ার অপেক্ষা, ব্যস ওটা তার হয়ে গেল। পরের গরমকাল আসার আগেই, অতীতের কঠোর জীবনযাত্রার ছাপ মুছে গেল ওর মুখের চেহারা থেকে। স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে ওর, গালে লেগেছে রঙের ছোঁয়া। ধূসর, ভাবুক চোখজোড়া দেখলে মনে হয় প্রচুর জ্ঞান রাখে মেয়েটি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ যদিও পায়নি। মাঝেমধ্যে চোখ দুটি খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত রাখার শিক্ষা পেয়েছে ও সেই ছোটকাল থেকে। হঠাৎ করে জাতে উঠে গেলে যে কোন তরুণীর মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাদের সাথে এলিজাবেথ-জেনের তুলনা চলে না। ভাগ্য যদি আবার বিরূপ হয়, এ ভাবনা সর্বক্ষণ সে মাথায় রাখে।

গাঢ় রঙের পোশাক পরে ও। বাইরে যখন যায় মাথায় থাকে কালো রঙের সিল্কের হ্যাট ও মামুলি সানশেড–আর ওটা এঁটে রাখার জন্যে হাতির দাঁতের তৈরি ছোট্ট এক আংটি।

হেঞ্চার্ড ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছে ওর। মার চাইতে ইদানীং তার সাথেই বাইরে বেশি যায় মেয়েটি।

একদিন নাস্তার টেবিলে ওরা তিনজন বসে, হেঞ্চার্ড প্রায়ই যা করে, নীরবে

চেয়ে রয়েছে এলিজাবেথ-জেনের দিকে। মেয়েটির চুলের হালকা-বাদামী রং আজ বিশেষ করে তার দৃষ্টি কাড়ল।

'যদ্দূর মনে পড়ে, এলিজাবেথ-জেনের চুলের রং···তুমি বলেছিলে ও বড় হলে কালো হয়ে যাবে।' স্ত্রীকে বলল হেঞ্চার্ড।

চমকে মুখ তুলে চাইল সুসান, পা ঝাঁকি দিল সাবধান করার ভঙ্গিতে। 'তাই বলেছিলাম নাকি?' বিড়বিড় করে আওড়াল।

এলিজাবেথ-জেন টেবিল ছেড়ে তার ঘরে চলে যেতে না যেতেই হেঞ্চার্ড বলল, 'হায় খোদা, ভুলেই গেছিলাম! আমি বলতে চাইছিলাম, ছোটবেলায় ওর চুল দেখলে মনে হত রংটা পরে গাঢ় হয়ে যাবে।'

'সবার হবে এমন কোন কথা নেই।'

'কিন্তু তাই বলে হালকা হবে?'

'হতেই পারে।' সেই পুরানো অস্বস্তির ছায়া ফুটে উঠল সুসানের চোখে-মুখে।

হেঞ্চার্ড ব্যাপারটা লক্ষ না করে বলে চলল, 'যাকগে, ওকে এতেই ভাল দেখায়।···আমি বলি কি, সুসান, সবাই ওকে মিস নিউসন না বলে মিস হেঞ্চার্ড বলে ডাকলে কেমন হয়? অবশ্য যারা জানে না তারা অনেকেই এ নামেই ডাকতে শুরু করেছে, তবে আমি চাই কাগজ-পত্রে লেখা হয়ে যাক। আমার সন্তান কেন অন্য লোকের নামে পরিচিত হবে? ক্যাস্টারব্রিজ কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেব আমি। সবাই দেয়। মেয়ে আপত্তি করবে না।'

'না, তা করবে না। কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নয়, আমি এটাই করব,' রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল হেঞ্চার্ড। 'ওর যদি আপত্তি না থাকে তোমার তো আপত্তি করার কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আমার চেয়ে কম থাকবে কেন?'

'বেশ। ও রাজি থাকলে আমাদের অসুবিধে কিসের,' জবাব দিল সুসান।

এলিজাবেথ-জেনকে গিয়ে হেঞ্চার্ডের প্রস্তাবটা জানাল মহিলা। সে এমন ধরনেরই মানুষ, সব সময় যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

'তোর রাজি হওয়াটা ঠিক হবে না, কি বলিস? নিউসন বেচারা মারা গেছে বলে তার নাম ত্যাগ করবি সেটা কি মোটেও উচিত কাজ হবে?'

এলিজাবেথ দেখল মা এ ব্যাপারে বেশ বিপর্যস্ত, কাজেই সৎ বাবার সাথে সে নিজে কথা বলবে জানাল।

পরে, সেদিনই দেখা করল ও হেঞ্চার্ডের সঙ্গে। তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, তার ইচ্ছে পূরণ করতে গেলে ও অপরাধবোধে ভুগবে। ওর মা যে মৃত বাবার প্রতি আবেগ উস্কে দিয়েছে সে কথা অবশ্য ভাঙল না।

'স্যার, খুব কি বেশি জরুরী এই নাম বদলের ব্যাপারটা?' প্রশ্ন করল ও।

'না, ঠিক আছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে বলব না আমি তোমাকে।'

বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেল এখানেই। এলিজাবেথ আগের মত নিজেকে মিস নিউসন নামেই পরিচয় দেয়, মিস হেঞ্চার্ড নামে নয়।

চার

ডোনাল্ড ফারফ্রের তত্ত্বাবধানে, মাইকেল হেঞ্চার্ডের ব্যবসা ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। স্মৃতি ও মুখের কথার ওপর নির্ভরশীল কারবারের বদলে এখন যা কিছু হচ্ছে সব কাগজে-কলমে। এতে করে অনেক ফালতু ঝুট-ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে।

এলিজাবেথের কামরা থেকে সৎ বাবার খড়ের গুদাম ও শস্যগোলা এবং সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখা যায়। এলিজাবেথ দেখতে পায় ডোনাল্ড ও মি. হেঞ্চার্ড সর্বক্ষণ একসঙ্গে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় হেঞ্চার্ড তার ম্যানেজারের কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছে। কখনও বা শোনা যায় ডোনাল্ডের কোন কথায় হা-হা করে হাসছে হেঞ্চার্ড, অথচ যুবক সম্পূর্ণ নির্বিকার। হেঞ্চার্ড তার মোটামুটি নিঃসঙ্গ জীবনে শুধু যে যুবকটির সান্নিধ্য উপভোগ করছে তা-ই নয়, তার ব্যবসায়িক পরামর্শগুলোর ফলে দারুণভাবে উপকৃতও হচ্ছে।

একদিন এলিজাবেথ ওপর থেকে চেয়ে রয়েছে, শুনতে পেল স্কটিশ যুবক বলছে, ওদের এভাবে একসাথে ঘোরাফেরার ফলে ব্যবসা দেখাশোনার ক্ষতি হচ্ছে। দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের সব সময় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা দরকার।

'আরে, রাখো তো!' কথাটা উড়িয়ে দিল হেঞ্চার্ড। 'আমার তো একজন কথা বলার লোক চাই, না কি? এখন চলো দেখি, বাসায় গিয়ে কিছু খাওয়া যাক। ওসব নিয়ে অত চিন্তা কোরো না তো, আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি!'

এলিজাবেথ আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। ও যখন মার সাথে হাঁটাহাঁটি করে, ডোনাল্ড ফারফ্রে চোখে কেমন এক অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। এলিজাবেথ বোঝে না কি এর কারণ, বিশেষ করে যুবকটির দৃষ্টি যেহেতু ওকে নয়, মাকে লক্ষ করে। মেয়েটির তো জানা নেই, ওর মার অতীত জানে বলেই ওভাবে তাকায় ফারফ্রে।

এলিজাবেথ-জেনের কাছে একদিন হাতে হাতে একখানা চিরকুট এসে পৌঁছুল। ডার্নোভার হিলের এক গোলাঘরে চিঠি পাওয়ামাত্র যেতে বলা হয়েছে। হেঞ্চার্ড এখান থেকেই শস্য কিনছে। ব্যবসায়ের ব্যাপার ভেবে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল মেয়েটি।

সহজেই খুঁজে বের করে ফেলল ও গোলাঘরটা। দরজা খোলা, কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। তবু প্রবেশ করল ও। অপেক্ষা করছে, এসময় এদিকে এগিয়ে আসতে লক্ষ করল ডোনাল্ড ফারফ্রেকে। যুবক ক্যাস্টারব্রিজ গির্জার ঘড়ির উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল একবার, তারপর সময়টা দেখে নিয়ে গোলাঘরের ভেতরে পা রাখল। হঠাৎই লজ্জাবোধ গ্রাস করল এলিজাবেথকে, যুবকটির সঙ্গে একাকী দেখা করতে মন চাইল না, ফলে তরতর করে মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল সে। গা

ঢাকা দিতে পারল যথাসময়ে। ফারফ্রে ধারণা করল, ও একাই উপস্থিত গোলাঘরে। বাইরে ইতোমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাই সে একখানা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৈর্য ধরে। ও-ও কারও না কারও জন্যে অপেক্ষা করছে, স্পষ্ট বোঝা গেল। এলিজাবেথের জন্যে? কিন্তু ওর জন্যে কেন করতে যাবে? পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল যুবক। এবার ঠিক এলিজাবেথেরটার মত একখানা চিরকুট বের করল।

ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে উঠছে, অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে চলল এলিজাবেথের। ফারফ্রের মাথার ওপর থেকে নেমে এলে ও যে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল সে কথা জেনে ফেলবে যুবক। নাহ্, যেমন আছি থাকি, নামব না–ভাবল এলিজাবেথ। ফার্মের একটা যন্ত্র ওর ঠিক পেছনে, উত্তেজনা কমানোর জন্যে আলতো করে ওটার হাতল ঘোরাতে লাগল ও। ধুলোর একটা মেঘ হঠাৎই পাক খেয়ে উঠে ওর সারা মুখে আর কাপড়চোপড়ে মাখামাখি হয়ে গেল। শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল ফারফ্রে, তারপর মইয়ের ধাপ বেয়ে উঠে এল ওপরে।

'আরে–মিস নিউসন যে,' ওকে দেখে বলল যুবক। 'আপনি এখানে জানিই না। আমি কিন্তু তলব পেয়ে ঠিক সময় মত চলে এসেছি।'

'আমিও তো,' বলল এলিজাবেথ। 'কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার সাথে দেখা করতে চাননি?'

'আমি দেখা করতে চাইব কেন? না, না। কোথাও কোন ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।'

কথা বলার ফাঁকে এলিজাবেথের কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে দিল ফারফ্রে, এবং তাকে মই বেয়ে নামতে সাহায্য করল।

'আপনি আমাকে আসতে বলেননি? এটা আপনি লেখেননি?' নিচে নেমে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল এলিজাবেথ।

'না, এধরনের কোন কাজ করার কথা আমার মাথাতেও আসেনি! কিন্তু আপনি–আপনি আমাকে এটা পাঠাননি?' নিজের চিরকুটটা দেখাল ও।

'না তো।'

'তারমানে কেউ একজন চেয়েছে আমরা দেখা করি। একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক বরং।'

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও কারও দেখা পেল না ওরা। বৃষ্টি ওদিকে পড়েই চলেছে।

'কেউ আসবে না,' বলল ফারফ্রে। 'কারও চালাকি এটা। খামোকা আমার সময়টা নষ্ট করাল, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'খুব খারাপ কথা,' বলল এলিজাবেথ।

'ঠিকই। কাজটা কার জানা যাবেই, মিস নিউসন। আমার সময় নষ্ট হয়েছে হোক, কিন্তু আপনাকে এখানে আনিয়ে শুধু শুধু কষ্ট দিল–'

'কষ্ট আর কি– কিছু মনে করিনি আমি।'

'আমিও।'

আবারও নীরবতা নামল গোলাঘরের ভেতর।

'আমাকে এখন যেতে হবে,' এলিজাবেথ বলল। 'বৃষ্টি পড়ুক আর না-ই পড়ুক।'

'ঠিক আছে। কিন্তু, মিস নিউসন, আপনি এ ঘটনাটার কথা কাউকে বলবেন না যেন, আর ব্যাপারটাকে পাত্তা দেবেন না। কাজটা যার সে যদি মুখ খোলে, তবে ভান করবেন যেন কিছুই হয়নি। এতে করে সেই চালাক মানুষটার হাসি মুছে যাবে।'

ছাতা এনে দেবে কিনা জানতে চাইল ফারফ্রে, কিন্তু এলিজাবেথ নিষেধ করল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বাসার পথ ধরল ও। ফারফ্রে শ্লথ পায়ে ওর পিছু পিছু হেঁটে চলল। মেয়েটির অপসৃয়মাণ দেহ চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ করছে। এলিজাবেথের সাদামাঠা সৌন্দর্য অবশেষে নজর কাড়ল ওর।

একদিনের কথা। নিজের ঘরে বসে মন দিয়ে ব্যাকরণ বই পড়ছে এলিজাবেথ। মেয়েটি তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে পুরোমাত্রায় সচেতন। কোন একটি ভাষা জানে না সে, ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কেই বা কতটুকু জ্ঞান রাখে? অথচ ভদ্রঘরের প্রতিটি তরুণীর এসব বিষয়ে জানা থাকা প্রয়োজন।

এলিজাবেথ জানালা দিয়ে চোখ রাখতে হেঞ্চার্ড ও ফারফ্রেকে উঠনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখতে পেল। দু'জনের মধ্যেকার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে কারও নজর কাড়বে।

ছটা বাজে প্রায়। কর্মচারীরা যে যার মত বাড়ির পথ ধরেছে। বাকি রয়েছে কেবল উনিশ-বিশ বছরের এক্রু তরুণ। ছন্নছাড়া ধরনের ছেলে, কেউ তার সাথে কথা বললে নিজের অজান্তেই কখন জানি মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলে হেঞ্চার্ড হাঁক ছাড়ল। 'অ্যাই, অ্যাবেল হুইটল্!'

হুইটল্ ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে এল কয়েক কদম। 'জ্বী, স্যার,' শঙ্কামাখা চাপা উত্তেজনা ওর কণ্ঠে, যেন জানা আছে এরপর কি আসছে। 'আবার বলছি–কাল সকালে যেন সময় মত কাজে আসতে দেখি। আমার কথা কানে গেছে নিশ্চয়ই? আমি কিন্তু আর কাজে গাফিলতি সহ্য করব না।'

'জ্বী, স্যার,' বলল অ্যাবেল, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ও চলে গেলে হেঞ্চার্ড ও ফারফ্রেও দাঁড়িয়ে থাকল না।

হেঞ্চার্ডের ওরকম কড়া কথা বলার উপযুক্ত কারণ আছে। 'অ্যাবেল হতভাগা,' এ নামেই ডাকা হয় তাকে, বড্ড ঘুমকাতুরে–কাজে দেরি করে আসে। এ সপ্তাহে দু'দিন ওর জন্যে প্রায় একটি কর্মঘণ্টা বরবাদ হয়েছে অন্যদের। সেজন্যেই হেঞ্চার্ড ধমকে দিয়েছে ওকে। এখন কাল কি হয় দেখার পালা।

ছটা বেজে গেল, কিন্তু হুইটলের পাত্তা নেই। সাড়ে ছটায় উঠনে প্রবেশ করল হেঞ্চার্ড। ঘোড়া জুড়ে রাখা হয়েছে হুইটলের ওয়াগনে, চালকের অপেক্ষায় তার সহযাত্রীরা বসে রয়েছে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে। অবশেষে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হলো হুইটল্, আর পড়বি তো পড় ঠিক হেঞ্চার্ডের সামনে। আরেক দিন এরকম দেরি করলে হেঞ্চার্ড নিজে গিয়ে টেনে তুলবে ওকে বিছানা থেকে, কঠোর ভাষায় শাসাল।

অ্যাবেল মরিয়া হয়ে অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করল।

'ওসব ধানাপানাই ছাড়ো!' গর্জে ওঠে হেঞ্চার্ড। 'কাল চারটের সময় ওয়াগন ছাড়া চাই, তা নাহলে বুঝো!'

পরদিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে ওয়াগনগুলোর। চারটে নাগাদ লণ্ঠন ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগল উঠনে। কিন্তু অ্যাবেল গরহাজির। কেউ গিয়ে ওকে ডেকে আনার আগেই হেঞ্চার্ড উদয় হলো উঠনে। ছেলেটি তার কথা কানে তোলেনি জানতে পেরে সোজা রওনা দিল ওর কটেজের উদ্দেশে। পেছনদিকের এক গলিতে থাকে ও, ঘরের দরজা যথারীতি খোলা পাওয়া গেল। অ্যাবেলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এমনই বাঘা গলায় গর্জন ছাড়ল মনিব, ঘুম ভেঙে আঁতকে উঠে বসল ছেলেটি। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছে ওর, চোয়াল ঝুলে পড়েছে অসহায় ভঙ্গিতে।

'নেমে আসুন, স্যার, এই মুহূর্তে কাজে যান। নইলে আর আমার ওখানে চাকরি করা হচ্ছে না। আশা করি এরপর থেকে আর ভুল হবে না। কই, গেলে না? ওভাবেই যাও, এখন আর পাজামা পরতে হবে না।'

হুইট্‌ল্ বেজার মনে ওয়েস্টকোট গায়ে চাপাল, তারপর সিঁড়ির গোড়ায় বসে বুটজোড়ায় তড়িঘড়ি পা গলাল। ওর মাথায় নিজেই হ্যাটখানা চাপিয়ে দিল হেঞ্চার্ড। কঠোর-মুখ মনিবের ভয়ে ছুটতে ছুটতে উঠনে এসে হাজির হলো হুইট্‌ল্।

ঠিক সে সময়, ফারফ্রেও এসেছে। লক্ষ করল ভোরের আবছা আলোয় সাদা কি একটা যেন পতপত করে উড়ছে। শীঘ্রিই বোঝা গেল ওটা অ্যাবেলের শার্টের একাংশ, ওয়েস্টকোটের তলা দিয়ে বেরিয়েছে।

'এ কি?' বলল ফারফ্রে। অনুসরণ করল অ্যাবেলকে। হেঞ্চার্ড তখনও এসে পৌঁছয়নি।

'দেখুন না, মি. ফারফ্রে,' কাতর কণ্ঠে বলল অ্যাবেল, 'উনি বলেছিলেন আমাকে শিক্ষা দেবেন, এখন তাই দিচ্ছেন। দেখুন না, ওঁর জন্যে কেমন ন্যাংটো হয়ে কাজে আসতে হলো। কিন্তু দেখে নেবেন, আমি ঠিক আত্মহত্যা করব। এই অপমান আমি সইতে পারব না। ব্রীচেস পরিনি বলে মহিলারা সব আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। আমি তা সহ্য করতে পারব না!'

'যাও, বাসায় গিয়ে ব্রীচেস পরে এসো! এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় মারা পড়বে!'

'কি ব্যাপার?' পেছন থেকে শোনা গেল হেঞ্চার্ডের গলা। 'কে ওকে বাড়ি পাঠাচ্ছে?'

সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ফারফ্রের ওপর।

'আমি,' বলল ডোনাল্ড। 'ব্যাপারটা আর ঠাট্টার পর্যায়ে নেই।'

'হুইট্‌ল্, আমি বলছি তুমি ওয়াগনে ওঠো।'

'আমি যতক্ষণ ম্যানেজার আছি উঠবে না,' বলল ফারফ্রে। 'ও হয় বাড়ি যাবে, আর নয়তো আমি চিরদিনের মত এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

হেঞ্চার্ডের মুখ টকটকে লাল। কঠোর। কিন্তু মুহূর্তের বিরতি নিল সে, এবং চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। ডোনাল্ড এগিয়ে গেল তার দিকে, লোকটির মুখের

চেহারায় অনুশোচনার অভিব্যক্তি লক্ষ করে।

'আপনাকে এসব নিষ্ঠুরতা মানায় না, স্যার,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফারফ্রে।

'এটা মোটেও নিষ্ঠুরতা নয়,' ছেলেমানুষের মত বিড়বিড় করে বলল হেঞ্চার্ড। 'ওর ভালর জন্যেই করা, খারাপের জন্যে নয়।' এবার নিদারুণ আহত কণ্ঠে বলে চলল সে, 'এতগুলো মানুষের সামনে আমার সাথে ওভাবে কথা বললে কেন, ফারফ্রে? আমরা একা হলে তারপর না হয় বলতে! ও–আচ্ছা! তোমাকে আমার জীবনের গোপন কথা বলেছি কিনা–মস্ত বোকামি করে ফেলেছি–তুমি এখন তার সুযোগ নিচ্ছ!'

'ওটার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই!' সহজ-স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ফারফ্রে। 'ওসব কথা আমার মনেই নেই।'

হেঞ্চার্ড নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মাটিতে চোখ রেখে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। সেদিনই কর্মচারীদের মুখে জানতে পারল ফারফ্রে, অ্যাবেলের বৃদ্ধা মাকে গত শীতকাল জুড়ে বিনে পয়সায় কয়লা ও কাঠ জুগিয়ে গেছে হেঞ্চার্ড। এর ফলে লোকটির প্রতি কঠোর মনোভাব অনেকটাই নমনীয় হলো ওর। ওদিকে হেঞ্চার্ড কিন্তু তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। শস্য এসেছে, কোথায় রাখা হবে এক কর্মচারী জানতে এলে তার জবাবে সে বলল, 'মি. ফারফ্রেকে জিজ্ঞেস করো। সে-ই তো মালিক এখানকার!'

কথাটা একদিক থেকে মিথ্যে নয়। ফারফ্রে আসার পর থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে সে হেঞ্চার্ডের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একদিন, ডার্নোভারের এক সদ্য মৃত চাষীর মেয়েরা এল। তাদের খড়ের গাদার প্রকৃত মূল্য কেমন হতে পারে সে বিষয়ে মতামত চাইতে এসেছে। মি. ফারফ্রেকে খুঁজল ওরা, কিন্তু সে তখন অনুপস্থিত। কাজেই হেঞ্চার্ডকে কথা বলতে হলো।

'বেশ তো, যাব আমি,' বলল সে।

'মি. ফারফ্রে আসতে পারতেন যদি–' বলল এক বোন।

'আমি ওদিকেই যাচ্ছি···ফারফ্রেকে লাগবে কেন?' হেঞ্চার্ড চিন্তিত দৃষ্টিতে চেয়ে। 'সবাই মি. ফারফ্রেকে খোঁজে কেন?'

'মনে হয় সবাই তাঁকে পছন্দ করে–লোকে তো তাই বলে শুনি।'

'ও, তাই বুঝি? লোকে তাই বলে, না? ওকে পছন্দ করে কেননা ও মি. হেঞ্চার্ডের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে, বেশি জানে–কি?'

'অনেকটা সেরকমই, স্যার,' অনিশ্চিত সুরে বলল অপর এক বোন।

'আর কি বলে শুনি? সব খুলে বললে ছয় পেন্স পাবে।'

'বলে ওঁর ব্যবহার ভাল, হেঞ্চার্ডকে বোকা মনে হয় ওঁর পাশে,' বলতে থাকে বাচ্চা মেয়েটা। 'উনি নাকি লোকের দুঃখ-কষ্ট বোঝেন–হেঞ্চার্ডের বদলে উনি এখানকার মনিব হলে নাকি ভাল হত।'

'পাঁঠারা কত কিছুই বলবে,' বিমর্ষচিত্তে বলল হেঞ্চার্ড। 'আচ্ছা, তোমরা এখন যেতে পারো। আর আমি আসছি তোমাদের ওখানে, ঠিক আছে?' ওরা চলে গেলে আপন মনে আওড়াল হেঞ্চার্ড, 'উনি এখানকার মনিব হলে ভাল হত, না?'

ডার্নোভারে যাবে বলে রওনা দিল সে। পথে দেখা হয়ে গেল ফারফ্রের সঙ্গে।

সে-ও ওদিকেই যাচ্ছিল। এক সঙ্গে পথ চললেও হেঞ্চার্ডের দৃষ্টি বেশিরভাগ সময় স্থির থাকল মাটিতে।

'কিছু হয়েছে নাকি?' ফারফ্রে প্রশ্ন করে।

'কই, না তো।'

'কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? আপনার তো খুশি থাকার কথা। আজ সকালে ভাল জাতের শস্য কেনা হয়েছে। সে যাকগে, ডার্নোভারের লোকেরা তাদের খড়ের দাম যাচাই করতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই যাচ্ছি আমি।'

'আমিও যাব আপনার সঙ্গে।'

হেঞ্চার্ড নিরুত্তর, ফলে ডোনাল্ড নিজের মনে শিস দিতে শুরু করল। মৃত কৃষকের বাড়ির দরজার কাছে এসে সে শিস বন্ধ করল। 'ওদের বাবা মারা গেছে, এখন শিস বাজানো ঠিক নয়।' বলল।

'মানুষ যাতে কষ্ট না পায় সেদিকে তোমার খুব খেয়াল, না?' বিদ্রূপের হাসি হেঞ্চার্ডের ঠোঁটের কোণে। 'আমি জানি–বিশেষ করে আমার ব্যাপারে!'

'মনে হচ্ছে আপনি আমার কোন কথায় কষ্ট পেয়েছেন। আপনাকে কোনভাবে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত, স্যার,' বলল ডোনাল্ড। আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, তার মুখের চেহারায় অনুতাপের অভিব্যক্তি। 'আপনি একথা বললেন কেন, স্যার, আর ভাবলেনই বা কিভাবে?'

হেঞ্চার্ডকে এতে খুশি মনে হলো। ডোনাল্ডের দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু চোখাচোখি হওয়ার সুযোগ দিল না। 'কিছু কিছু কথা কানে আসায় বিরক্ত হয়েছি আমি,' বলল সে। 'সে কারণেই হয়তো কিছুটা মেজাজ করে ফেলেছি, তোমার প্রতি ভুল ধারণা হয়েছে। যাকগে, খড়ের ব্যাপারটা তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝো তুমিই দেখো, ফারফ্রে। আর ওরা চেয়েছেও তোমাকে। আমাকে টাউন কাউন্সিলের মীটিঙে যেতে হবে, সময় তো প্রায় হয়েই গেল।'

এভাবে নতুন করে বন্ধুত্ব গড়ার পর বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। হেঞ্চার্ডের মনের শান্তি ফিরে এল আবার। তবে যখনই ফারফ্রের কথা ভাবে, ক্ষীণ একটা ভয় কাবু করে ফেলে তাকে। কেন যে ছেলেটাকে জীবনের গোপন কাহিনী বলতে গেছিল, এখন আফসোস হয়। সিদ্ধান্ত নিল দূরত্ব বজায় রাখবে সে যুবকটির সঙ্গে। অবশ্য তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক রুটিনে এর কোন প্রভাব পড়তে দেবে না।

জীবন বয়ে চলল স্বাভাবিক নিয়মে, যদ্দিন না ঘোষিত হলো বিশেষ সেই সরকারী ছুটি। রাজপুত্র এডওয়ার্ডের দশম জন্মবার্ষিকী পালন করবে গোটা জাতি। সেই উপলক্ষে ছুটি।

ক্যাস্টারব্রিজে বেশ কিছুদিন কোন আমোদ-ফুর্তি হয়নি। ডোনাল্ড ফারফ্রে বিষয়টি তুলল হেঞ্চার্ডের কাছে। খড় ঢাকা দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত গোটা কয় ক্যানভাসের ঢাকনি পেতে পারে কিনা জানতে চাইল। বিশেষ দিনটি সে ও আরও কয়েকজন মিলে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করবে।

'যতগুলো ইচ্ছে নিতে পারো,' বলল হেঞ্চার্ড।

ঠিক এর পরপরই হেঞ্চার্ড উপলব্ধি করল, শহরের মেয়র হিসেবে তার

ওপরও দায়িত্ব বর্তায় কোন একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার। সেজন্যে কাউন্সিলের সভা ডাকতে হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, কর্তারা গুছিয়ে ওঠার আগেই সব আয়োজন সেরে ফেলেছে ফারফ্রে। হেঞ্চার্ড ভাবনায় পড়ে গেল। অবশেষে ঠিক করল, অন্যান্য কাউন্সিলরদের আপত্তি না থাকলে সে নিজেই কিছু একটা বিনোদনের আয়োজন করবে। আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, তারা বরং সমস্ত দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

জমকালো অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল হেঞ্চার্ড। এমন অনুষ্ঠান করবে সে, ক্যাস্টারব্রিজের মানুষের তাক লেগে যাবে, বৃদ্ধি পাবে প্রাচীন শহরটির সম্মান। ফারফ্রের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার কথা প্রায় ভুলেই গেল সে। স্কটিশ যুবকটি বলেছে, সে দর্শনীর ব্যবস্থা রাখবে। মানুষের তো আর খেয়ে কাজ নেই গাঁটের পয়সা খরচা করে অনুষ্ঠান দেখতে আসবে। মেয়র সবার জন্যে বিনামূল্যে অনুষ্ঠান করবে।

মেয়রের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে লোকের খুশি ধরে না, বিশেষ করে দর্শনীর যেহেতু বালাই থাকছে না। সারা শহর জুড়ে বড় বড়, গোলাপী রঙের পোস্টার লাগানো হলো। শহরের সীমান্তবর্তী এক মাঠে নানা ধরনের খেলা-ধুলা আর বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। সে সঙ্গে থাকছে চায়ের আয়োজন। সবার দাওয়াত।

এল সেই বিশেষ সকালটি। দু'একদিন আগেও আকাশ ছিল ঝকঝকে, কিন্তু আজ দেখা গেল মেঘাচ্ছন্ন–বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা। বেলা বারোটা নাগাদ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো, তারপর বেড়ে চলল ক্রমেই।

প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল, কিন্তু তিনটের দিকে বোঝা গেল অনুষ্ঠান পণ্ড হতে চলেছে। লোকজন সরে পড়তে লাগল হতাশ মনে।

ছটা নাগাদ ঝড় কেটে গেল। অনুষ্ঠান চালু করার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। টেবিলগুলো, চাঁদোয়া এসব ঠিকঠাক করা হলো। তলব করা হলো ছাউনিতে আশ্রয় নেয়া বাদক দলকে। নাচের জন্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখার ব্যবস্থা করা হলো।

'কিন্তু লোকজন সব গেল কোথায়?' আধ ঘণ্টা পর বলল হেঞ্চার্ড, কেননা নাচবে বলে দু'জন পুরুষ ও এক মহিলা কেবল অপেক্ষা করছে।

'সবাই গেছে ফারফ্রের অনুষ্ঠানে,' এক কাউন্সিলর জানাল। মেয়রের সঙ্গে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

ভাবমগ্ন হেঞ্চার্ড ধীরে ধীরে সরে গেল ওখান থেকে। কেউ কেউ তখনও আশাবাদী ছিল অনুষ্ঠান শুরু করা যাবে, কিন্তু হেঞ্চার্ড সমস্ত কর্মকাণ্ড স্থগিত করে দিল। খাবার-দাবার যা ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলা হলো। একটু পর দেখা গেল গোটা কয় খুঁটি ছাড়া মাঠে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

হেঞ্চার্ড বাড়ি ফিরে এল। পরিবারের দুই সদস্যের সঙ্গে বসে চা পান করে আবার বেরিয়ে পড়ল। সাঁঝ লেগে এসেছে। আর সবার মত সে-ও বাজনার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ফারফ্রের তাঁবু লক্ষ্য করে।

ভেতরে প্রবেশ করল সে। লোকজন নাচছে। শান্ত-শিষ্ট ফারফ্রেকে আজ দেখা গেল বুনো হাইল্যান্ড স্কটসম্যানের বেশে, বাজনার তালে তালে মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে হাসি চাপতে পারল না হেঞ্চার্ড।

গোটা শহর বুঝি ভেঙে পড়েছে এখানে। আলো সহ্য হলো না হেঞ্চার্ডের, বেরিয়ে এল ও। কিন্তু ছায়াও তাকে স্বস্তি দিতে পারল না। এখান-সেখান থেকে বিরূপ উক্তি কানে ভেসে এল ওর। ওকে নিয়ে, ওর অনুষ্ঠান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে লোকজন। কে একজন তো বলেও বসল, ফারফ্রে না থাকলে ওর ব্যবসা নাকি লাটে উঠত, কেননা হিসেব-নিকেশ কিছুই নাকি বোঝে না হেঞ্চার্ড। 'দেখে নিয়ো, ওই ছেলে বেশিদিন ওর সাথে থাকবে না,' বলল লোকটা। 'নিজেই একদিন ব্যবসা শুরু করে দেবে।'

রাগ ফেনিয়ে উঠছে হেঞ্চার্ডের মনের মধ্যে। এই ছেলেকে আর রাখবে না সে। আঠারো বছর ধরে তার গড়ে তোলা ভাবমূর্তি ধ্বংস করে দিচ্ছে সেদিনের এই নাদান ছোকরা। নাচের আসরে ফিরে গেল হেঞ্চার্ড। ফারফ্রেকে দেখল এলিজাবেথের সাথে নাচতে। নাচ শেষে হেঞ্চার্ডের দিকে সম্মতির হাসি প্রত্যাশা করে চাইল মেয়েটি, কিন্তু হেঞ্চার্ড দেখেও দেখল না।

'ফারফ্রে,' অন্যমনস্ক দেখাল হেঞ্চার্ডকে। 'কালকে তোমার আর কাজে আসতে হবে না, আমিই সামলে নেব। ধকল তো আর কম গেল না তোমার ওপর দিয়ে।' ঠোঁটের কোণে ধরে রাখা স্মিত হাসিটা ঘৃণায় রূপ নিয়েছে ওর।

শহরবাসীদের ক'জন এদিকে এগিয়ে এলে ডোনাল্ড একটু পিছিয়ে গেল।

'খোলা মাঠে অনুষ্ঠান করতে যাওয়াটাই তোমার ভুল হয়েছে, হেঞ্চার্ড। ওর মত তোমারও উচিত ছিল ছাউনির নিচে খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা। এই বুদ্ধিটা তোমার মাথায় আসেনি বলেই মার খেয়ে গেলে।' বলল একজন।

'ও জীবনে অনেক উন্নতি করবে,' বলল অপরজন। 'তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে।'

'তারমানে মি. ফারফ্রে আর বেশিদিন ম্যানেজারি করছে না,' বিষাদ ঝরল মেয়রের কণ্ঠে। 'কি বলো, মি. ফারফ্রে?'

হেঞ্চার্ডের মুখের চেহারার অভিব্যক্তি পড়তে কষ্ট হলো না, ফলে নীরবে মাথা নাড়ল যুবক। কেন চাকরি করবে না, লোকের কৌতূহলের জবাবে সে জানাল, 'আমাকে আর হয়তো প্রয়োজন নেই মি. হেঞ্চার্ডের।'

হেঞ্চার্ড আপাত সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু পরদিন সকাল বেলা উপলব্ধি করল, হিংসের বশবর্তী হয়ে কী আচরণটাই না সে করেছে গতকাল। মনটা আরও দমে গেল এই ভেবে, ফারফ্রে ওর কথাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।

এলিজাবেথ কাল সৎ বাবার হাবে-ভাবে বুঝে গিয়েছিল, ফারফ্রের সঙ্গে নেচে কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছে সে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ও। বেরোনোর সময় দেখা হয়ে যায় ফারফ্রের সঙ্গে।

'এই যে, মিস নিউসন, আপনাকেই খুঁজছিলাম,' মনিবের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা ঝেড়ে ফেলে চনমনে হওয়ার চেষ্টা করছে যুবক। 'আমি কি আপনার সঙ্গে

রাস্তার মোড় অবধি যেতে পারি?'

কাজটা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু নিষেধই বা করবে কোন্ যুক্তিতে? কাজেই রাজি হতে হলো ওকে।

'শীঘ্রি হয়তো এখান থেকে চলে যাব আমি,' এক পর্যায়ে বলল ফারফ্রে।

'কেন?' যুবকের কথার অর্থ বুঝতে পারেনি এলিজাবেথ।

'ব্যবসায়িক ব্যাপার–অন্য কিছু নয়। আপনার সাথে আরেক দফা নাচার ইচ্ছে ছিল, হলো না। আপনার বাবা বোধহয় বিরক্ত হয়েছেন আপনাকে আমার সাথে নাচতে দেখে। আমাকে সম্ভবত এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

এলিজাবেথ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে স্কটিশ যুবকটি বলে চলল, 'আমার যদি টাকা থাকত, আর আপনার সৎ বাবা যদি রেগে না থাকতেন; তবে আজ রাতে আপনাকে একটা কথা বলতাম। কিন্তু তা তো আর হবার নয়! যাকগে, আমি চলে গেলে আপনারা আমাকে ভুলে যাবেন না তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' এক নিঃশ্বাসে বলল এলিজাবেথ-জেন। 'আর যাবেনই বা কেন? আমি চাই না আপনি চলে যান।'

রাস্তার আলোর কাছে এসে পড়েছে ওরা। 'কথাটা আমার মনে থাকবে,' বলল ডোনাল্ড ফারফ্রে। 'আমি আর এগোলাম না, এখান থেকেই বিদায় নিই। আমাকে দেখলে আপনার বাবা হয়তো আরও খেপে যাবেন।'

ক্যাস্টারব্রিজে খবরটা রাষ্ট্র হতে দেরি হলো না হেঞ্চার্ড ও ফারফ্রে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এলিজাবেথ উৎকণ্ঠায় ভুগতে লাগল, ফারফ্রে কি সত্যিই চলে যাবে? ও মনে প্রাণে কামনা করে এ শহরেই রয়ে যাবে যুবকটি। শেষমেশ খবর পাওয়া গেল থাকছে ফারফ্রে। সে স্বয়ং শস্য ও খড়ের ব্যবসা চালু করতে যাচ্ছে।

এলিজাবেথের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল খবরটা শুনে। ওকে যদি লোকটি ভালই বাসত তাহলে কি আর হেঞ্চার্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা মাথায় আনত? অবশ্যই না। ওদিন হয়তো মানসিকভাবে দুর্বল ছিল ফারফ্রে, তাই অমন আবেগময় কথা-বার্তা বলে ফেলেছিল।

হেঞ্চার্ড একদিন ডেকে পাঠাল এলিজাবেথকে। বৈঠক ঘরে প্রবেশ করে, সৎ পিতার মুখের দিকে চাইতে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

'ওই ফারফ্রে লোকটা সম্পর্কে তোমাকে সাবধান করতে চাই, বাছা। আমি জানি ওর সাথে তোমার বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। না, আমি তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু, বাছা, ওকে তুমি ভুল করে কোন প্রতিশ্রুতি-টুতি দিয়ে বসোনি তো? কিংবা তেমনি ধরনের কিছু?'

'না তো।'

'বেশ। সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি চাই না তুমি ওর সাথে আর দেখা করো।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'কথা দিচ্ছ তো?'

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে জবাব দিল মেয়েটি, 'হ্যাঁ, আপনি যখন চান না।'

'চাই না, কারণ ও এ বাড়ির শত্রু।'

এলিজাবেথ চলে গেলে ফারফ্রের উদ্দেশে একখানা চিরকুট লিখে ফেলল হেঞ্চার্ড:

'স্যার,

আপনাকে অনুরোধ করছি আমার সৎ মেয়ের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবেন না। ও আমাকে কথা দিয়েছে আপনার সঙ্গে আর দেখা করবে না; আশা করি আপনিও দেখা করার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকবেন।

ম. হেঞ্চার্ড।'

এ ঘটনার কিছুদিন পর জার্সি থেকে একটা চিঠি এল হেঞ্চার্ডের কাছে। ওটার লেখিকা লুসেটা, হেঞ্চার্ডের সেই পূর্ব পরিচিতা। চিঠি পড়ে জানা গেল, হেঞ্চার্ড যেহেতু কোন কথাই গোপন করেনি তাই সে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরও মহিলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এখন সে চায় তাদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক ছিল সেটি যাতে গোপন থাকে। মহিলা তার দেয়া সবগুলো চিঠি ফেরত চেয়েছে। আর তার ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগানোর জন্যে হেঞ্চার্ড যে মোটা অঙ্কের টাকাটা পাঠিয়েছে সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছে। ব্রিস্টলে মহিলার এক ধনী আত্মীয়া রয়েছে, আপাতত সেখানে বেড়াতে যাচ্ছে সে। ফিরবে ক্যাস্টারব্রিজ হয়ে। চিঠিগুলো তখন কি ফেরত দিতে পারবে হেঞ্চার্ড? বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এন্টেলোপ হোটেলে ঘোড়া বদল করবে ওর কোচ। চিঠিগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেয়ার চাইতে এভাবে হাতে হাতে ফিরে পেতেই বেশি আগ্রহী সে। চিরদিন ভালবাসার অঙ্গীকার করে লেখা শেষ করেছে মহিলা।

ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল হেঞ্চার্ডের। 'বেচারী–আমার সাথে ওর পরিচয় না হলেই ভাল হত! ওকে বিয়ে করার সামান্যতম সুযোগ থাকলেও করতাম আমি! সত্যি করতাম!'

নিঃসন্দেহে মিসেস হেঞ্চার্ডের মৃত্যুর কথা ভাবছে সে।

অনুরোধ অনুসারে, লুসেটার সব কটা চিঠি একসাথে করে পার্সেলটা সযত্নে রেখে দিল হেঞ্চার্ড।

বুধবারের সেই বিকেলটা ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা, আর কোচটাও এল দেরি করে। হেঞ্চার্ড এগিয়ে গেল গাড়িটার উদ্দেশে। কিন্তু কোথায় লুসেটা? কোন কারণে নিশ্চয়ই পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছে ও, এই ভেবে বাড়ি ফিরে গেল হেঞ্চার্ড। লুসেটার সাথে দেখা হলো না বলে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল সে।

পাঁচ

ওদিকে মিসেস হেঞ্চার্ডের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। বাড়ির বাইরে যায় না আর সে। বহু ভাবনা-চিন্তা করার পর একদিন কাগজ-কলম চেয়ে পাঠাল মহিলা। কিছু একটা লেখার ইচ্ছে। তার অনুরোধে, একটা ট্রের ওপর কাগজ-কলম রেখে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া হলো। অল্প কিছুক্ষণ লেখার পর কাগজটা সযত্নে

ভাঁজ করল মহিলা, তারপর ওটার মুখ এঁটে দিয়ে ওপরে প্রাপকের নাম লিখল। সব শেষে এলিজাবেথকে ডেকে কাগজটা তালা মেরে রাখতে বলল তার ডেস্কের দেরাজে। মহিলা যা লিখেছে তা এরকম:

'মি. মাইকেল হেঞ্চার্ড। এলিজাবেথ-জেনের বিয়ের দিন পর্যন্ত এ চিঠি খোলা যাবে না।'

এলিজাবেথ মার শিয়রে বসে থাকে রাতের পর রাত। আর সে সময় মিসেস হেঞ্চার্ড প্রায়ই উঠে বসার চেষ্টা করে, কি যেন বলতে চায় মেয়েকে।

'তোকে আর মি. ফারফ্রেকে চিরকুট পাঠানো হয়েছিল মনে আছে–ডার্নোভারে একজনের সাথে দেখা করার কথা বলা হয়েছিল–তোরা ভেবেছিলি তোদেরকে বোকা বানানোর জন্যেই কেউ কাজটা করেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়ে।

'তোদের বোকা বানাতে নয়–এক করানোর জন্যে কাজটা করা হয়েছিল। চিরকুট দুটো পাঠিয়েছিলাম আমি।'

'কেন?'

'আমি চাইতাম তুই মি. ফারফ্রেকে বিয়ে কর।'

'বলো কি, মা!'

'হ্যাঁ রে। তার কারণ ছিল। একদিন সেটা জানতে পারবি। আমি থাকতে থাকতে যদি বিয়েটা দিয়ে যেতে পারতাম! কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আরেক! হেঞ্চার্ড ছেলেটাকে ঘৃণা করে।'

'কে জানে হয়তো আবার খাতির হয়ে যাবে।' বিড়বিড় করে আওড়াল এলিজাবেথ।

পরের সপ্তাহ আসার আগেই পৃথিবীর মায়া কাটাল মিসেস হেঞ্চার্ড।

হেঞ্চার্ড ও এলিজাবেথ আগুন পোয়াতে বসে কথা-বার্তা বলছে। মিসেস হেঞ্চার্ডের শেষকৃত্য হয়ে গেছে তিন সপ্তাহ।

'এলিজাবেথ, তুমি কি পুরানো দিনের কথা খুব ভাবো?'

'জ্বী, স্যার, প্রায়ই ভাবি।'

'কাদের কাদের কথা বেশি ভাবো?'

'মা আর বাবা–আর কারও না।'

'হুঁ, আমার কথা ভাববেই বা কিভাবে?' বলল হেঞ্চার্ড। 'আচ্ছা, নিউসন বাবা হিসেবে কেমন ছিল?'

'খুব ভাল।'

হেঞ্চার্ডের মুখের চেহারায় কোমল ভাব ফুটল। 'ধরো, আমি যদি তোমার আসল বাবা হতাম?' বলল। 'আমাকে কি তবে নিউসনের সমান ভালবাসতে?'

'আমি আর কাউকে নিজের বাবার জায়গায় কল্পনা করতে পারি না,' ত্বরিত জবাব এল।

হায়, মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে গেছে হেঞ্চার্ডের স্ত্রীকে; বিবাদ ছিনিয়ে নিয়েছে উপকারী বন্ধুকে; আর এলিজাবেথ-জেনকে হারাতে বসেছে মেয়েটির অজ্ঞতার

কারণে। তার মনে হলো, স্মৃতির দরজা মেলে ধরতে হবে এখন দু'জনের একজনকে, এবং মেয়েটিরই সেটা করা উচিত।

'আমার কথা তোমাকে তোমার মা কতটা বলেছে?' দীর্ঘ নীরবতার পর প্রশ্ন করল হেঞ্চার্ড।

'আপনি বিয়ের সূত্র ধরে মার আত্মীয় হন।'

'আরও কিছু ওর বলা উচিত ছিল! তাহলে আমার কাজটা এত কঠিন হত না···এলিজাবেথ, আমি তোমার আসল বাবা, রিচার্ড নিউসন নয়।'

এলিজাবেথ নিথর বসে রইল, শ্বাস নিচ্ছে কিনা কাঁধ দেখে বোঝার উপায় নেই। হেঞ্চার্ড কথার খেই ধরল: 'তুমি আমাকে ঘৃণা করো, ভয় করো, যা-ই করো না কেন সবই আমি মানতে রাজি আছি–কিন্তু অজ্ঞতা নয়। তোমার মা যৌবনে আমার স্ত্রী ছিল। তুমি যা দেখেছ সেটা আমাদের দ্বিতীয় বিয়ে। আমি ভেবেছিলাম তোমার মা মারা গেছে, আর ও ভাবে আমি বেঁচে নেই। এভাবেই নিউসনের সাথে ওর বিয়ে হয়ে যায়।'

সত্যের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে হেঞ্চার্ড। ওদিকে, অতীত জীবনের বেশ কিছু ঘটনা পরম্পরা মেয়েটিকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করল হেঞ্চার্ডের কথা। মন ভেঙে গেল মেয়েটির, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কেঁদো না! কেঁদো না!' বলল হেঞ্চার্ড। 'আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমার বাবা। তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার কাছে এতটাই খারাপ, এতটাই অসহ্য? আমাকে ঘৃণা করিস না, মা!' এলিজাবেথের হাত চেপে ধরল সে। 'আমি তোকে ওর চাইতে অনেক বেশি আদর করব, অনেক বেশি ভালবাসব। আমাকে শুধু বাবা বলে স্বীকার করে নে, তোর জন্যে সব কিছু করব আমি।'

এলিজাবেথ উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হতে চাইল হেঞ্চার্ডের, কিন্তু পারল না। লোকটা কেন জানি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তাকে।

'যাই,' এলিজাবেথকে বিপর্যস্ত লক্ষ করে বলল হেঞ্চার্ড। 'কালকে আবার কথা বলা যাবে, তোমাকে প্রমাণ হিসেবে কিছু কাগজপত্র দেখাব। আর হ্যাঁ, তোমার নামটাও কিন্তু আমার দেয়া, মা মণি; তোমার মা চেয়েছিল সুসান রাখবে। চলি।' বেরিয়ে গেল সে, কিন্তু এলিজাবেথকে নড়ার সময়টুকু পর্যন্ত না দিয়ে ফিরে এল আবার।

'আরেকটা কথা, এলিজাবেথ,' বলল। 'তোমার উচিত বংশের নাম ব্যবহার করা। তোমার মা অবশ্য এর বিরোধী ছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছে তুমি আমার নামে পরিচিত হও। আইন অনুসারে নামটা তোমার প্রাপ্য। তবে লোকের তা জানার দরকার কি? সবাই ভাবুক তুমি নিজের ইচ্ছেয় নিয়েছ। আমি আমার উকিলের সাথে কথা বলব–সঠিক আইনটা আমার নিজেরও জানা নেই। সে কথা থাক, কাগজে যদি একটা বিজ্ঞাপন দিই তুমি এখন থেকে হেঞ্চার্ড নাম গ্রহণ করছ তাহলে আপত্তি আছে?'

'এটা যদি আমার বংশের নামই হয় তবে আর নিতে আপত্তি থাকবে কেন?' পাল্টা বলল এলিজাবেথ। 'কিন্তু মা কেন চায়নি তাই ভাবছি।'

'কত রকম উদ্ভট খেয়াল থাকে না মানুষের? এখন কাগজ-কলম নাও দেখি,

যা বলি লিখে ফেলো।'

এলিজাবেথ লিখল, এখন থেকে সে আর এলিজাবেথ-জেন নিউসন নয়, এলিজাবেথ-জেন হেঞ্চার্ড নামে নিজের পরিচয় দিতে আগ্রহী। ক্যাস্টারব্রিজ কাগজের দফতরে পাঠানো হবে ওটা।

আত্মতৃপ্তি ফুটে উঠল হেঞ্চার্ডের মুখের চেহারায়, তার কোন ইচ্ছা পূরণ হলে এমনটা প্রতিবারই হয়। এলিজাবেথকে আগামীকাল প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র দেখাবে কথা দিয়ে বিদায় নিল সে।

এলিজাবেথ এবার আগুনের পাশে গিয়ে বসল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিল মেয়েটি দয়ালু নাবিক রিচার্ড নিউসনের কথা স্মরণ করে। তার কেন জানি মনে হচ্ছে, মানুষটির প্রতি কোন গুরুতর অন্যায় করতে চলেছে সে।

হেঞ্চার্ড ইতোমধ্যে ওপরতলায় গিয়ে তার দেরাজের তালা খুলেছে। এখানে ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাখে সে। কাগজগুলো বার করার আগে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভাবনায় ডুবে গেল সে। মেয়েকে শেষ পর্যন্ত আপন করে পাওয়া গেল। এলিজাবেথ যেমন বুদ্ধিমতী, কোমল হৃদয়া মেয়ে তাতে করে বাপকে পছন্দ না করে পারবে না সে।

দেরাজের ওপর ঝুঁকে পড়ল আবার হেঞ্চার্ড। এখানে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর ডেস্কে যেসব জিনিস ছিল সেগুলোও এনে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই চিঠিটিও রয়েছে যেটার ওপর লেখা: *'এলিজাবেথ-জেনের বিয়ের দিন পর্যন্ত এ চিঠি খোলা যাবে না।'* মুখটা আঁটতে পারেনি ঠিকমত। খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল কাগজটা। হেঞ্চার্ড নিরুৎসুক দৃষ্টি বুলোতে লাগল ওটার ওপর।

'প্রিয় মাইকেল–আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যে এখন অবধি তোমার কাছে একটা বিষয় গোপন করে রেখেছি। আশা করি তুমি কারণটা বুঝতে পারবে। এ চিঠি যখন তুমি পড়বে তখন আমি কবরে, আর এলিজাবেথ-জেন স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। এবার আসি আসল কথায়, এই এলিজাবেথ-জেন তোমার এলিজাবেথ-জেন নয়–আমাকে যখন বিক্রি করে দাও তখন যে আমার কোলে ছিল। না, সে মারা গেছে ও ঘটনার তিন মাস পর। আর যে বেঁচে আছে সে আমার দ্বিতীয় স্বামীর মেয়ে। আগের জনের নামে ওর নাম রাখি আমি, প্রথম সন্তান বিয়োগের বেদনা ভুলে থাকার জন্যে। মাইকেল, আমি এখন মৃত্যু পথযাত্রী। হয়তো চুপ করে থাকতে পারতাম টুঁ শব্দটি না করে, কিন্তু পারলাম না যদি পারো আমাকে ক্ষমা কোরো।

সুসান হেঞ্চার্ড।

ফাঁকা দৃষ্টিতে চিঠিখানার দিকে চেয়ে রইল হেঞ্চার্ড, যেন ওটা ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেছে কয়েক মাইল। কেন সুসান মেয়ের পদবী পাল্টাতে চায়নি তা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার।

হাল ছেড়ে দেয়া নাবিকের মত ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঠায় বসে রইল ও; তারপর হঠাৎই যেন হুঁশ ফিরে পেয়ে স্বগতোক্তি করল, 'এসব কথা মিথ্যেও তো হতে পারে!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে, একখানা মোমবাতি হাতে এলিজাবেথ-জেনের

ঘরের দরজা অবধি হেঁটে গেল ও। এবার দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল মেয়েটির। আলতো মোচড়ে হাতল ঘুরিয়ে, ভেতরে পা রাখল হেঞ্চার্ড। হাত দিয়ে আলো ঢেকে, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। আলোটা ধীরে ধীরে মেয়েটির মুখের ওপর এনে স্থির করল, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ নিরীখ করল ওর মুখমণ্ডল।

মুখের রং, গায়ের চামড়া ফর্সা এলিজাবেথের, অথচ ওরটা কালচে ধরনের। ঘুমন্ত তরুণীর অবয়বের মধ্যে সে রিচার্ড নিউসনের দেহরেখা স্পষ্ট দেখতে পেল। হঠাৎই অসহ্য লেগে উঠল ওর, তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল ও ঘর থেকে।

এ আর কিছু নয়, শাস্তি দিচ্ছে তাকে নিয়তি–অনুভব করল হেঞ্চার্ড। মেয়েটির পিতৃত্ব দাবি করতে না করতেই জানতে হলো, সে তার সন্তান নয়। এরচেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে। কিন্তু যে অবস্থান নিয়েছে সেখান থেকে পিছিয়ে আসবে না সে। একবার যখন এলিজাবেথকে বলেই ফেলেছে সে তার বাবা, তখন চিরদিন তাই ভাবতে হবে মেয়েটিকে–এর অন্যথা চলবে না।

কিন্তু নতুন ভূমিকায় প্রথম পদক্ষেপ কি হতে পারে জানা ছিল না হেঞ্চার্ডের। সে নাস্তার টেবিলে আসা মাত্র এলিজাবেথ উঠে দাঁড়িয়ে ওর একটা হাত ধরল।

'কাল সারা রাত ভেবেছি ও ব্যাপারটা নিয়ে,' খোলা মনে স্বীকার করল এলিজাবেথ। 'চিন্তা করে দেখলাম, তুমি যা বলেছ তাই হওয়া উচিত। তোমাকে এখন থেকে বাবা বলে ডাকব আমি, মি. হেঞ্চার্ড বলে আর কখনও না। হ্যাঁ, বাবা, এতে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সুযোগ নেই। তুমি আমার জন্যে এপর্যন্ত যা যা করেছ সৎ বাপ হলে কি করতে? মা হয়তো একটা ভুলের কারণে মি. নিউসনকে বিয়ে করেছিল, আর সে মানুষটাও খুব ভাল ছিল, কিন্তু তাই বলে তো আর আপন বাপকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। নাও, বাবা, নাস্তা করতে বসো।' খোশমেজাজে বলল ও।

হেঞ্চার্ড মনে মনে খুশি হলো, ভাগ্যিস সুসানের দ্বিতীয় বিয়ের পটভূমি এলিজাবেথকে বলে দেয়নি।

হেঞ্চার্ড ঝুঁকে পড়ে দায়সারাভাবে চুমো খেল মেয়েটির গালে, এতটুকু সাড়া জাগল না তার প্রাণে। বেচারার সমস্ত খুশি-আশা এক রাতের মধ্যে পরিণত হয়েছে ছাই-ভস্মে।

এলিজাবেথ অবশ্য সঙ্গত কারণেই বুঝতে পারল না, বাবা হঠাৎ করে এমন শীতল, পর-পর ভাব দেখাল কেন। নিজেকে ওর আপন বাবা বলে ঘোষণা দেয়ার পরের সকালেই এভাবে বদলে গেল কেন মানুষটা?

শীতল-নিস্পৃহ আচরণ শীঘ্রিই রূপ নিল খোলামেলা সমালোচনায়। এলিজাবেথের মুখ নিঃসৃত আঞ্চলিক শব্দগুলো আজকাল যেন প্রকট হয়ে কানে বাজছে হেঞ্চার্ডের।

এলিজাবেথ নিজেকে মার্জিত, পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন, বাবার চোখে কিছুতেই আর সে ভাল হতে পারে না। বাসায় একাকী থাকতে হয় তাকে, হেঞ্চার্ড এখন আর সময় দেয় না মোটেই। অগত্যা পড়াশোনায় মন ঢেলে দিল মেয়েটি, তাতে যদি বাবার মন পায়।

ভয়ে ভয়ে এখন দিন কাটে বেচারীর। হেঞ্চার্ডের বদ মেজাজের চাইতে তার উপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট দেয় ওকে। ও বুঝে গেছে, বাবা ওকে যে কোন কারণেই হোক পছন্দ করতে পারছে না। আর তাই বাবাকে সন্তুষ্ট করতে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

যখনই সুযোগ পায়, ওর মাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে চলে যায় এলিজাবেথ। এক সকালে, কবরস্থানের ভেতর দিয়ে হাঁটছে, লক্ষ করল শোক পোশাক পরা কে এক মহিলা ওর মার কবরের উদ্দেশে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। এমুহূর্তে মিসেস হেঞ্চার্ডের সমাধিস্তম্ভে খোদাই করা লেখাটা পড়ছে সে। মহিলা শোক পালন করছে ওরই মত, কিন্তু তার পোশাক-আশাকের জৌলুস এলিজাবেথের চাইতে অনেকটাই বেশি। কোত্থেকে এল মহিলা? পরনের কাপড় আর হাতে ধরা গাইড বই দেখলে বোঝা যায় ক্যাস্টারব্রিজের কেউ না।

মহিলা ইতোমধ্যে কবরের কাছ থেকে সরে, দেয়ালের কোনার পেছন দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এলিজাবেথ নিজে এবার এগিয়ে গেল সমাধির কাছে। মাটিতে একজোড়া পদচিহ্ন। মহিলার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার লক্ষণ। বাড়ি ফিরে এল এলিজাবেথ, ভেবে ভেবে সে কোন কূল-কিনারা করতে পারল না কে এই মহিলা, কেন সে ওর মার কবরে গিয়েছিল।

এদিকে, ঘরের বাইরে উত্তেজনার খোরাক পেলেও ঘরের ভেতরে বাজে একটা দিন কাটাতে হলো এলিজাবেথকে। হেঞ্চার্ডের দু'বছর মেয়াদী মেয়র-জীবনের ইতি ঘটতে চলেছে, এবং তাকে জানানো হয়েছে তার অল্ডারম্যান (শহর কাউন্সিলের সিনিয়র সদস্য, সহ-কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত) হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই; আর ফারফ্রে সম্ভবত কাউন্সিলরদের একজন হতে চলেছে।

স্ত্রী এ শহরে আসার পর থেকেই যেন শনির দশা শুরু হয়েছে হেঞ্চার্ডের। কিংস আর্মসে বন্ধুদের সঙ্গে সেই ডিনারটিই যেন সূচনা করেছে এই ভাগ্য পরিবর্তনের। শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে জায়গা হচ্ছে না তার, কী লজ্জার কথা! মনটা তেতো হয়ে গেল হেঞ্চার্ডের।

'তা কোথায় ছিলে শুনি?' এলিজাবেথ ফিরতে শাণিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'গির্জায় গেছিলাম, বাবা, খুব বে-দম–মানে ক্লান্ত লাগছে!' আঞ্চলিক শব্দ উচ্চারণ করে ফেলায় আতঙ্কে মুখে হাত চাপা দিল মেয়েটি, কিন্তু রক্ষে পেল না। মেজাজ হারাতে এটুকু উস্কানিই যথেষ্ট হেঞ্চার্ডের জন্যে।

'আবার এসব গেঁয়ো কথা-বার্তা শুনছি!' বজ্র গর্জাল তার কণ্ঠে। 'বে-দম, হুঁহ। লোকে শুনলে মনে করবে তুমি কোন খেতে-খামারে কাজ করো! জেনে রাখো, এভাবে চলতে থাকলে এক বাড়িতে বাস করা আর সম্ভব হবে না।'

বলাবাহুল্য, হেঞ্চার্ডের অগ্নিমূর্তি লক্ষ করে ভয়ে কাবু হয়ে পড়ল এলিজাবেথ।

হেঞ্চার্ড এখন বসে বসে ভাবছে, খামোকাই এ মেয়ের সাথে ফারফ্রের দেখা-সাক্ষাতের বিষয়টিকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সে। এই মেয়ে তার কে? বরঞ্চ ওদের মেলামেশা করতে দিলে আজকে এই ধাড়ী মেয়ের দায়িত্ব তাকে নিতে হত না। অবশেষে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেখার টেবিলে এসে বসল ও। ফারফ্রের

উদ্দেশে যা লিখল সেটা এরকম:

'স্যার, ভেবেচিন্তে দেখলাম, আপনি এলিজাবেথ-জেনকে পছন্দ করলে আমার তাতে বাধা দেয়া ঠিক নয়। আমি আমার আপত্তি তুলে নিচ্ছি। আমার বাড়ি ছাড়া অন্য যে কোনখানে আপনারা দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারেন।

আপনারই

ম. হেঞ্চার্ড।'

পরদিন, আবহাওয়া মনোরম দেখে এলিজাবেথ আবারও চার্চইয়ার্ডে গেল। ওর মনের যা অবস্থা, মার সঙ্গে কেন সে নিজেও মরল না অজান্তে এ আক্ষেপ প্রকাশ করে ফেলল। পরমুহূর্তে কাছে একটা বেঞ্চি পেয়ে তাতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পেছনে হঠাৎ কি যেন স্পর্শ করল ওর বেঞ্চি। ঘাড় ফিরিয়ে চাইতে দেখতে পেল, নেকাব ঢাকা একখানা মুখ ঝুঁকে আছে, তবে চেহারা দেখতে অসুবিধে হলো না। গতকালকের সেই যুবতী মহিলা।

কোন সাড়া-শব্দ নেই দু'মুহূর্ত, তারপর এলিজাবেথ অনুভব করল মহিলা ওর পাশে এসে বসছে।

'তোমার দুঃখ আমি বুঝি,' বলল মহিলা। 'তোমার মার কবর, তাই না?' হাত নেড়ে সমাধিস্তম্ভটা দেখাল। মহিলার কণ্ঠস্বরে এমন এক আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল, এলিজাবেথ গড়গড় করে তাকে সব বলে দিতে চাইল।

'মা ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।'

'কিন্তু তোমার বাবা, মি. হেঞ্চার্ড তো বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে ভালবাসেন না?'

'আমি কোন অভিযোগ করব না।'

'কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'তেমন কিছু না।'

'হয়তো তোমারই দোষ।'

'অস্বীকার করছি না।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল এলিজাবেথের।

জবাবটা ওর প্রতি উষ্ণ করে তুলল যেন মহিলাকে।

'উনি কিন্তু লোক খারাপ নন, কি বলো?' এলিজাবেথের পাশে বসে হেঞ্চার্ডকে দোষারোপ করার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে মহিলা।

'না, না, খারাপ হতে যাবেন কেন,' সায় দিল মেয়েটি। 'এই সেদিন পর্যন্ত আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন উনি। আমার অবশ্য ভীষণ অস্বস্তি হত। আমি ভদ্রলোকদের আদব-কায়দা পুরোপুরি শিখে উঠতে পারিনি বলেই উনি আমার ওপর কিছুটা বিরক্ত—অন্য কোন কারণ নেই। আর শিখবই বা কিভাবে, আমার ছোটবেলায় তো সে সুযোগ পাইনি।'

'কেন পাওনি জানতে পারি?'

এলিজাবেথ-জেন বিষণ্ন চোখে মহিলার দিকে এক নজর চেয়ে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মাটিতে। 'সে অনেক কথা। শুনে মজা পাবেন না। তবু যদি শুনতে চান

তবে বলতে আপত্তি নেই।'

মহিলা শুনতে চায়, ফলে নিজের জীবনকাহিনী এক নাগাড়ে বলে শেষ করল মেয়েটি। তবে বলাবাহুল্য, মেলার মাঠে মাকে বিক্রি করে দেয়ার বিষয়টির অবতারণা করেনি সে। আর জানলে তো করবে। নতুন বন্ধুটিকে বিস্মিত মনে হলো না ওর কাহিনী শুনে। এটা লক্ষ করে খুশি হয়ে উঠল এলিজাবেথ। কিন্তু বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়তেই উবে গেল সমস্ত উদ্দীপনা।

'কোথাও যদি চলে যেতে পারতাম!' আওড়াল ও। 'কিন্তু যাব কোথায়?'

'আমার একজন হাউজকীপার প্রয়োজন,' মৃদু স্বরে বলল নতুন বন্ধুটি। 'তুমি নেবে কাজটা?'

'নেব না মানে!' চোখে পানি চলে এল এলিজাবেথের। 'নিশ্চয়ই নেব। আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তখন হয়তো বাবা আমাকে ভালবাসবেন। কিন্তু হায়!'

'কি হলো?'

'আমি যে লেখাপড়া জানি না। আপনার সঙ্গীকে নিশ্চয়ই শিক্ষিত হতে হবে?'

'হতেই হবে তেমন কোন কথা নেই।'

'তাই? কিন্তু আমার মুখের ভাষা, হাতের লেখা কোনটাই জাতের না। যদিও আমি সাধ্যমত উন্নতি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আপনি কোথায় থাকেন তা-ই তো জানা হলো না।'

'কাল থেকে ক্যাস্টারব্রিজে থাকব। হাই-প্লেস হল নামের বাড়িটা সেজন্যে ঘষা মাজা করা হচ্ছে। মার্কেট প্লেসে যে পুরানো পাথরের বাড়িটা রয়েছে সেটাই। তুমি আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আগামী হপ্তার প্রথম দিন সোজা এখানে চলে এসো, কাজটা করছ কিনা জানিয়ো।'

এলিজাবেথের চোখজোড়া চকচক করে উঠল, হেঞ্চার্ডের বাড়ি ত্যাগ করতে পারার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে। চার্চইয়ার্ডের গেট থেকে বিদায় নিল ওরা পরস্পরের কাছ থেকে।

সেদিন সন্ধেতেই হেঞ্চার্ডকে বাড়ি ছাড়ার কথা বলবে ঠিক করল ও, অবশ্য মেজাজ-মর্জি ভাল দেখলেই কেবল কথাটা পাড়বে। লোকটি বাড়ি না ফেরা অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে সময় কাটাল এলিজাবেথ। যথারীতি রাগের বিন্দু মাত্র লক্ষণ দেখা গেল না হেঞ্চার্ডের মধ্যে–স্রেফ শীতল উপেক্ষা। এর ফলে বাড়ি ত্যাগের ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে উঠল মেয়েটির। বাবার মাথা-গরম অবস্থাতেও যা হয়তো এতখানি হত না।

'বাবা, আমি যদি চলে যাই তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'চলে যাবে! যাও না। তা কোথায় যাচ্ছ?'

এখনই বলে ফেলা ঠিক হবে না, ভাবল এলিজাবেথ। শীঘ্রিই জেনে যাবে এমনিতেই।

'একটা সুযোগ এসেছে, যেখানে কাজ-কর্ম, লেখাপড়া, আদব-কায়দা সব কিছুই একসঙ্গে শেখা যাবে,' দ্বিধা ফুটল ওর কণ্ঠে। 'মার্জিত লোকজনের সাথে

মেলামেশার সুযোগ পেতে পারি, এক বাসায় হাউজকীপারের কাজ নিলে।'

'সুযোগটা তোমার অবশ্যই নেয়া উচিত।'

'তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি–আমার? না, না।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'আর টাকা-পয়সার জন্যে ভেবো না। আমি তোমাকে হাতখরচা দিতে রাজি আছি। কেননা, ও চাকরি করে আর ক'টাকাই বা পাবে তুমি?'

প্রস্তাবটির জন্যে ধন্যবাদ জানাল এলিজাবেথ।

বাৎসরিক একটা বাঁধা টাকা দিতে চাইল হেঞ্চার্ড ওকে। 'এর ফলে তোমাকে আমার মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না–আর আমিও বাঁচব। কি, ঠিক আছে না?'

দ্বিমত করার প্রশ্ন ওঠে না এলিজাবেথের।

মেয়েটির দায় থেকে মুক্ত হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হেঞ্চার্ড। তো, বিষয়টির ফয়সালা হলো এভাবেই, এলিজাবেথের এখন কেবল সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষা।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করতে গেল এলিজাবেথ। মহিলা অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

'কি ঠিক করলে?'

'কাজটা করব।'

'তোমার বাবা রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, চলে এসো।'

'কখন?'

'যখন তোমার ইচ্ছে। আজই এসো না। এতবড় বাড়িতে আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।'

'তাহলে আজই চলে আসি।'

'কোথায় থাকতে যাচ্ছ বাবাকে জানিয়েছ?'

'না।'

'ওহ্–জানাওনি কেন?'

'আগে বাড়ি তো ছাড়ি–বাবা যা রগচটা মানুষ!'

'হয়তো ঠিক কাজই করেছ···ও কথা থাক, তোমাকে তো এখন পর্যন্ত আমার নামটাই বলা হয়নি। মিস টেম্পলম্যান। আজ, এই ধরো, ছটার দিকে চলে এসো, কেমন?'

হেঞ্চার্ড কিন্তু ভাবতেও পারেনি এত শীঘ্রি বিদায় নেবে এলিজাবেথ। বাড়ি ফিরে ওকে ক্যারিজে মালপত্র তুলতে দেখে থ বনে গেল লোকটি।

'তুমি বলেছিলে চাইলে আমি চলে যেতে পারি, বাবা,' ক্যারিজের জানালা দিয়ে মুখ বের করে ব্যাখ্যা দিল এলিজাবেথ।

'তাই বলেছিলাম! হ্যাঁ! আমি ভেবেছিলাম তুমি পরের মাসে কিংবা পরের বছর যেতে চাও। এত তাড়াতাড়ি যে চলে যাবে ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। তোমার জন্যে এত ভুগলাম তার এই প্রতিদান!'

'বাবা, ওভাবে বোলো না। তোমার ওভাবে বলা ঠিক না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল এলিজাবেথ।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছু মনে কোরো না,' জবাব দিল লোকটি। বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। লটবহর সব নামানো হয়নি এখনও, তা লক্ষ করে মেয়েটির ঘরে চলে এল হেঞ্চার্ড। দিনের বেলা এখানে আগে কখনও ঢোকেনি সে। চারদিকে যত্নের ছাপ স্পষ্ট। নিজেকে পরিমার্জিত করে তোলার কত রকম চেষ্টাই না করেছে মেয়েটি–নানা ধরনের বইপত্র, মানচিত্র, নকশা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঘরের চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও, সিধে চলে এল দরজার কাছে।

'এই যে,' গলার সুর পাল্টে গেছে ওর–নাম ধরে আর ডাকে না সে এলিজাবেথকে–'না গেলে হয় না? আমি হয়তো তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি, কিন্তু তুমি কি জানো তোমার কারণে আমাকে কতখানি দুঃখ পেতে হয়েছে?'

'আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি?' গভীর উদ্বেগে প্রশ্ন করল মেয়েটি। 'কি করেছি আমি?'

'এখন বলা সম্ভব না। কিন্তু তুমি যদি না গিয়ে এ বাড়িতে আমার মেয়ে হিসেবে বাস করো, তাহলে সময় হলে সবই জানতে পারবে।'

প্রস্তাবটা এল দশ মিনিট দেরি করে। এলিজাবেথ উঠে বসেছে ক্যারিজে, এবং ইতোমধ্যে কল্পনায় সেই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণীর বাড়িতে পৌঁছে গেছে।

'বাবা,' যথাসম্ভব নম্র গলায় বলতে চেষ্টা করল ও, 'আমার আপাতত চলে যাওয়াই ভাল। আর দূরে তো যাচ্ছি না, কাছেই থাকছি। তুমি খুব প্রয়োজন মনে করলে না হয় ফিরে আসব।' সামান্য মাথা ঝাঁকাল হেঞ্চার্ড। 'তোমার ঠিকানাটা পেতে পারি, নাকি তাতেও আপত্তি আছে?'

'কি যে বলো না। এই তো হাই-প্লেস হলে থাকব আমি।'

'কোথায়?' মুখের চেহারা আড়ষ্ট হয়ে গেল হেঞ্চার্ডের।

শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করল এলিজাবেথ। এক বিন্দু নড়ল না লোকটা, টুঁ শব্দটা করল না। তার উদ্দেশে হাত নেড়ে কোচোয়ানকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দিল মেয়েটি।

হেঞ্চার্ডের এহেন মনোভাবের কারণ জানতে হলে আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যেতে হবে গতকাল রাতে। লুসেটার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছে সে:

হাই-প্লেস হল

'প্রিয় মি. হেঞ্চার্ড,

চমকে যেয়ো না। আমাদের দু'জনের ভালর জন্যেই আমাকে ক্যাস্টারব্রিজে বাস করতে আসতে হলো। এখানে কতদিন থাকব জানি না। সেটা নির্ভর করে বিশেষ একজন পুরুষ মানুষের ওপর। সে একাধারে ব্যবসায়ী, মেয়র এবং আমার ভালবাসার পাত্র।

কথাগুলোকে হালকাভাবে নিয়ো না। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে এ শহরে এসেছি আমি। অবশ্য তাকে অনেক বছর আগেই মৃতদের খাতায় তুলে রেখেছিলে তুমি! আহা বেচারী, তুমি তার প্রতি ন্যায্য বিচার করেছ বলে আমি আনন্দিত। তোমার স্ত্রী মারা গেছে জানামাত্র নিজের কলঙ্ক ঘোচাবার চিন্তা মাথায় আসে আমার, তুমি যেহেতু আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। আশা করি, ভাবনাটা তোমার মাথাতেও এসেছে, এবং তুমি বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আমাদের সম্পর্কচ্ছেদের পর তোমার তেমন কোন খোঁজ-খবর পাইনি। তাই ভাবলাম, তোমার সাথে দেখা করার আগে নিজেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে নিই।

দু'একদিনের মধ্যেই দেখা হচ্ছে। সে পর্যন্ত বিদায়।

–তোমার
লুসেটা।

বি: দ্র: তোমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে পারিনি একটি পারিবারিক কারণে, শুনলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে।'

কানাঘুষা থেকে হেঞ্চার্ড ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছিল, জনৈক মিস টেম্পলম্যান হাই-প্লেস হলে উঠতে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল হেঞ্চার্ড।

'লুসেটা মনে হচ্ছে মিস টেম্পলম্যানের আত্মীয়,' আপন মনে বলল। মহিলা ওর জীবনে ফিরে আসছে জেনে ভারি উৎসাহিত বোধ করল হেঞ্চার্ড। এলিজাবেথ-জেন ওর সন্তান নয় জানার পর থেকে অন্তরটা ওর খাঁ-খাঁ করছে। এ নিদারুণ শূন্যতা ভরাট করতে ওর অবচেতন মন কাউকে না কাউকে ভালবাসতে চাইছে।

আচ্ছা, একটা চিন্তা ঘাই মারল হেঞ্চার্ডের মাথায়–লুসেটা আর মিস টেম্পলম্যান কি একই মানুষ? মনে পড়ছে, লুসেটা প্রায়ই ধনী আত্মীয়র প্রসঙ্গ উঠলে এ নামটি উচ্চারণ করত। হেঞ্চার্ড যদিও ধনসম্পদের কাঙাল নয়, কিন্তু ধনবতী ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যে লুসেটার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এতে তার কোন সন্দেহ নেই।

হেঞ্চার্ডকে অবশ্য বেশিক্ষণ সাত-পাঁচ ভাবতে হলো না। লুসেটা চিরকুট লিখতে চিরকালই পারদর্শী। এলিজাবেথ বিদায় নিতে না নিতেই মেয়রের বাসায় আরেকখানা চিরকুট এসে হাজির।

'আমি থিতু হয়েছি,' লিখেছে। 'এবং বেশ ভালই আছি। যদিও এখানে আসতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। হয়তো বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি। আমার খালা মিসেস টেম্পলম্যান সম্প্রতি মারা গেছেন। আমাকে কিছু সম্পত্তি তিনি দান করে গেছেন। খুঁটিনাটির মধ্যে যাচ্ছি না, শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমি খালার নাম গ্রহণ করেছি–এভাবে নিজের নাম ও তার কলঙ্ক থেকে যদি বাঁচতে পারি।

আমি এখন স্বাধীন, এবং এখানেই থাকব ঠিক করেছি। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের বিষয়টা ইতোমধ্যে নিশ্চয় জেনে গেছ। ওর সাথে প্রথমবার দেখা হয় কাকতালীয়ভাবে, কিন্তু ওকে কেন আমার সাথে বাস করতে বলেছি

জানো? তুমি যাতে করে ওর সঙ্গে দেখা করার উছিলায় আমার বাসায় আসতে পারো। ও খুব ভাল, ভদ্র মেয়ে। ওর ধারণা, তুমি ওকে কষ্ট দিয়েছ। রাগের মাথায় হয়তো কখনও দুর্ব্যবহার করে থাকবে, মন থেকে নিশ্চয়ই নয়। আমি অবশ্য তোমার ওপর রাগ করিনি, কারণ তা নাহলে তো ওকে এখানে পেতাম না।

শুধু তোমারই,

লুসেটা।'

হেঞ্চার্ডের বুঝতে বেগ পেতে হলো না, লুসেটা বিয়ের কথা বলতে চায়। এছাড়া আর কিইবা চাইবে বেচারী? হেঞ্চার্ডকে ভালবেসে কম তো নাকাল হতে হয়নি তাকে। হেঞ্চার্ড দেখা করবে ওর সঙ্গে, এবং এখুনি।

ও যখন পৌঁছল, ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। জবাব এল, মিস টেম্পলম্যান আজ রাতে ব্যস্ত, কাল ও এলে খুশি হবে।

'দাম দেখাচ্ছে!' ভাবল হেঞ্চার্ড। কিন্তু ওর যেহেতু আসার কথা ছিল না, নীরবে প্রত্যাখ্যানটা মেনে নিতে হলো। তবে আগামীকাল আর আসবে না ও। দেখা যাক কি করে লুসেটা।

লুসেটা পরদিন হেঞ্চার্ডের জন্যে সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসে থাকল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে কখন হেঞ্চার্ড আসে। এলিজাবেথকে কিন্তু জানায়নি কাকে আশা করছে।

শুধু সে দিন কেন, আরও অনেক কটা দিন চলে গেল, কিন্তু মেহমানের দেখা মিলল না। লুসেটা অবশ্য প্রতিদিন সকালে তৈরি হয়ে বসে থাকে। লুসেটা হেঞ্চার্ডকে বিবেকের তাড়নায় বিয়ে করতে চায় বটে, কিন্তু একটা বিষয় মাথায় নেই হেঞ্চার্ডের–টাকাকড়ির অভাব নেই তো আর লুসেটার। তার নিজেরই এখন প্রচুর রয়েছে।

মঙ্গলবার নাগাদ বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল লুসেটা।

'তোমার বাবা আজ হয়তো তোমাকে দেখতে আসবে,' শীতল সুরে বলল ও।

মাথা নাড়ল এলিজাবেথ। 'আসবে না।'

'কেন?'

'আমার ওপর খেপা।'

'তারমানে ঝগড়াটা আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও মারাত্মক?'

'হ্যাঁ,' নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বলল মেয়েটি।

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, তুমি যেখানে থাকবে সেখানে যাবে না সে?'

বিমর্ষ ভঙ্গিতে সায় জানাল এলিজাবেথ।

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল লুসেটার। সে তো এমনটা কল্পনাও করেনি। এখন কি করা? মাথা খাটানোর চেষ্টা করল ও। এলিজাবেথকে কিছু জিনিস কিনে আনতে বলল, আর সে সঙ্গে দেখে আসতে বলল স্থানীয় জাদুঘরটা। দু'এক ঘণ্টা একটু একা থাকার সুযোগ মিলল এর ফলে।

'আমাকে আজ খসাতে চাইছে কেন?' মনে ব্যথা নিয়ে ভাবল এলিজাবেথ, তবে তড়িঘড়ি বেরিয়েও পড়ল।

ও বেরিয়েছে দশ মিনিটও হয়নি, লুসেটার এক ভৃত্যকে একখানা চিরকুট

দিয়ে পাঠানো হলো হেঞ্চার্ডের কাছে। চিঠিটা এরকম:

'প্রিয় মাইকেল,

আমি জানি আজ তুমি হাটে থাকবে। আমার সাথে দেখা কোরো প্লীজ। তুমি না আসাতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। তোমার মেয়ের উপস্থিতি হয়তো সেজন্যে দায়ী। চিন্তা নেই, আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি আসছ ব্যবসার কাজে। আমি একা থাকব।

লুসেটা।'

ছয়

লুসেটা বসে বসে অপেক্ষা করছে হেঞ্চার্ডের জন্যে। কাজের লোককে বলে রেখেছে, ভদ্রলোক এলেই যেন তাকে খবর দেয়া হয়।

মন থেকে দেখা করার কোন তাড়না অনুভব করে না সে, কিন্তু বিষয়টা যেহেতু জরুরী···উপায় কি? অবশেষে সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। লুসেটা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক দৌড়ে গিয়ে আড়াল নিল পর্দার। আশ্চর্য এক লজ্জা গ্রাস করেছে ওকে। হেঞ্চার্ডের জন্যে সেই আবেগ না থাকলেও পরিস্থিতিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত টানটান উত্তেজনা রয়েছে। জার্সিতে শেষবার দেখা হয় দু'জনের, তারপর এবারই প্রথম হতে যাচ্ছে।

কাজের লোক অতিথিকে ঘরে বসিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল, তারপর যেন গৃহকর্ত্রীকে খুঁজতে যাচ্ছে এমনি ভাব করে বেরিয়ে গেল। এক টানে পর্দা সরিয়ে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে অভিবাদন জানাল লুসেটা। কিন্তু একি! ওর সামনে দাঁড়ানো লোকটি তো হেঞ্চার্ড নয়। মেয়রের চেয়ে বয়স অনেক কম এ সুদর্শন যুবকটির। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল লুসেটা। 'ওহ, আমার ভুল হয়েছে!'

অতিথিও ক্ষমা প্রার্থনা করল।

'আমি এসেছি মিস হেঞ্চার্ডের কাছে, তো আমাকে এখানে নিয়ে এল,' ব্যাখ্যা করল। 'মনে হচ্ছে ভুল বাড়িতে এসে পড়েছি,' ভীরু কণ্ঠে বলল।

'না, না–বসুন। এসেই যখন পড়েছেন তখন বসতেও হবে,' বিহ্বল ভাব কাটিয়ে সপ্রতিভ হতে চাইল লুসেটা। 'মিস হেঞ্চার্ড এখুনি চলে আসবে।'

কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়, কিন্তু যুবকটির মধ্যে কিছু একটা আছে লুসেটাকে যা দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে চেয়ারে বসল যুবক।

ফারফ্রের আসার কারণ আর কিছু নয়, হেঞ্চার্ড অনুমতি দিয়েছে বলেই সে এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ব্যবসা রীতিমত চালু হয়ে গেছে তার, চাইলেই এখন বিয়ে করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে এলিজাবেথের চাইতে ভাল পাত্রী আর কোথায়? ওকে শুধু যে পছন্দ করে ফারফ্রে তা নয়, ওদের বিয়েটা হলে পরে হেঞ্চার্ডের সঙ্গে পুরানো বন্ধুত্বটাও হয়তো ঝালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

'হাটে আজ অনেক মানুষ,' বলল লুসেটা। কিছু একটা করতে হয়, তাই ওরা

দু'জনেই রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

একটু দূরে এক বৃদ্ধ মেষপালক ও তার ছেলেকে দেখা গেল। কাজের সন্ধান করছে। এক ফার্মার ওদেরকে নিতে চাইল, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তার খামারটা এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। মেষপালকের ছেলে যাকে ভালবাসে, সেই মেয়েটিও দাঁড়িয়ে ওখানে। ফ্যাকাসে-উৎকণ্ঠিত মুখে চেয়ে তার প্রেমিকের উদ্দেশে। সে কি ওকে ছেড়ে নতুন কাজে যোগ দেবে?

'আমাকে যেতে হচ্ছে, নেলি,' আবেগের সুরে বলল যুবক। 'দেখতেই তো পাচ্ছ না গিয়ে উপায় নেই। এখানে বেকার বসে থাকতে হবে। ভেবো না, মাত্র তো পঁয়ত্রিশ মাইল।'

কেঁপে গেল মেয়েটির ঠোঁটজোড়া। 'পঁয়ত্রিশ মাইল!' আওড়াল বিড়বিড় করে। 'আর কখনও তোমাকে দেখতে পাব না! সেই কোন মুল্লুকে চলে যাচ্ছ তুমি!' ঘুরে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে লাগল ও। ফার্মার জানাল, মনস্থির করার জন্যে সে ওদের আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছে।

লুসেটার অশ্রুসজল চোখ দুটো মিলিত হলো ফারফ্রের চোখের সঙ্গে।

'আহা রে, কী কষ্ট,' বলল গভীর আবেগে। 'প্রেমিক-প্রেমিকার এভাবে আলাদা হওয়া ঠিক নয়। ইস, আমাকে যদি কেউ বর দিত, তাহলে ভালবাসার মানুষদের একসঙ্গে থাকার সুযোগ দিতে বলতাম।'

'আমি হয়তো এদেরকে সাহায্য করতে পারব,' কোমল স্বরে বলল ফারফ্রে। 'দেখি, ওরা আমার ফার্মে কাজ করবে কিনা।'

'আপনি এত ভাল!' খুশি ধরে না লুসেটার। 'ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, রাজি হলে আমাকে জানাবেন কিন্তু।'

ফারফ্রে বেরিয়ে গেল। ওকে দলটির সঙ্গে কথা বলতে দেখল লুসেটা। খানিক বাদে সবাইকে বেশ খুশি-খুশি দেখাল। ফারফ্রে ফিরে এল তখুনি। লুসেটা সব শুনে ওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল। দু'জনে টুকটাক কথা-বার্তা বলছে, এক সময় ফারফ্রের দৃষ্টি ফের জানালাপথে বাইরে চলে গেল।

দু'জন ফার্মার দেখা হওয়াতে করমর্দন করল। জানালার এতটাই কাছে তারা, পরিষ্কার কানে আসছে তাদের কথোপকথন।

'মি. ফারফ্রেকে আজকে দেখেছেন?' একজন প্রশ্ন করল।

'বারোটার সময় আমার সাথে এখানে দেখা করার কথা, কিন্তু কই, দেখছি না তো।'

'একদম ভুলেই গেছি,' বিড়বিড়িয়ে বলল ফারফ্রে।

'আপনার যাওয়া উচিত,' বলল লুসেটা।

'হ্যাঁ,' বলল বটে, কিন্তু নড়ল না ফারফ্রে।

'না গেলে কিন্তু একটা কাস্টোমার হারাবেন,' তাগাদা দিল মহিলা।

যে ফার্মারটি একে খুঁজছে তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অবশেষে বলল ফারফ্রে, 'থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কি আর করা! ব্যবসা ব্যবসাই, কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি অন্য সময় আসব, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'নিশ্চয়ই আসবেন,' বলল লুসেটা। 'আমাদের আজকের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, তাই না?'

'দু'জনে একান্তে বসে ভাবার মত।'

'তা বলতে পারি না। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপনার ব্যবসা আপনাকে ডাকছে।'

'হ্যাঁ, বাজার-ব্যবসা! দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকলে কি এমন ক্ষতিটা হত?'

লাজুক হাসি হাসল লুসেটা। অদ্ভুত এক আবেগ কাজ করছে তার ভেতর।

'আপনার এতটা পরিবর্তন কিন্তু ঠিক নয়।'

'আমিও তো তা চাই না,' নিজের দুর্বলতায় খানিকটা লজ্জিত দেখাল যুবককে। 'আসলে এখানে এসে আপনাকে দেখার পর···যাকগে, বাইরে গেলে হয়তো ব্যবসা বুদ্ধি ফিরে পাব!'

ও বেরিয়ে যাচ্ছে, এসময় লুসেটা সাগ্রহে বলল, 'শীঘ্রিই হয়তো লোকমুখে আমার কথা শুনতে পাবেন। তাদের কেউ কেউ হয়তো কোন কোন ঘটনার জন্যে আমাকে রঙ্গিণী বলতে পারে, আপনি কিন্তু ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ আমি তেমন মেয়ে নই।'

'করব না,' জোর গলায় জানান দিল ফারফ্রে।

ওকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখানো হলো। সে যে এলিজাবেথের কাছে এসেছিল বেমালুম ভুলে গেছে কথাটা। লুসেটা জানালায় দাঁড়িয়ে, যতক্ষণ না ফারফ্রে চোখের আড়াল হলো চেয়ে রইল।

তিন মিনিট বাদে মেইড উঠে এল ওর ঘরে।

'মেয়র এসেছেন,' জানাল। 'হাতে নাকি সময় নেই।'

'ও! তাহলে ওঁকে জানিয়ে দাও আমার মাথা ব্যথা, আজ আর তাঁর সময় নষ্ট করব না।'

খবরটা পৌঁছে গেল নিচে এবং দরজা লেগে গেল।

লুসেটা স্বস্তিবোধ করল। এলিজাবেথ ফিরে এলে মধুর স্বরে তাকে বলল, 'তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

বেচারী এলিজাবেথ-জেন! লুসেটা প্রথমে চেয়েছিল ও মাইকেল হেঞ্চার্ডকে এ বাড়িতে টেনে আনবে। যখন জানল, বাপ-বেটীর মধ্যে শীতল সম্পর্ক ওর পরিকল্পনায় বাদ সাধতে পারে, তখন বেশ বিরক্তই হয়েছিল। আর এখন ওই লোক না এলেই সে খুশি, কারণ তার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় একজনের দেখা পাওয়া গেছে।

এলিজাবেথ-জেন কিন্তু এসবের কিছুই আঁচ করতে পারল না। সে তো জানে না, ফারফ্রে ওর খোঁজে এসেছিল, এবং অতি সহজেই ওকে ভুলে গেছে। বরঞ্চ লুসেটা ওকে থাকতে বলাতে ও নিশ্চিন্ত বোধ করল।

দিন চলে যাচ্ছে এভাবে। একদিন চাকার জোরাল ঘর-ঘর শব্দ জানালায়

টেনে আনল দুই মহিলাকে। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে, প্রকাণ্ড এক কিম্ভূত যান থেমে দাঁড়িয়েছে। কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য নতুন ধরনের এক যন্ত্র ওটা–নাম হর্স-ড্রিল। বাজার এলাকায় দস্তুরমত সাড়া পড়ে গেল। কৃষকরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে যন্ত্রটাকে, আর নারী-শিশুরা উত্তেজিত স্বরে কিচিরমিচির করছে।

'ফসলের খেতে নিশ্চয়ই কাজে লাগে,' বলল এলিজাবেথ। 'কে আনতে পারে?'

ডোনাল্ড ফারফ্রে সে মুহূর্তে এসে হাজির হলো ওখানে। যন্ত্রটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে ঘুরে-ঘুরে দেখল, তারপর এমনভাবে হাতাল ওটাকে যেন এ যন্ত্র তার বহুদিনের চেনা।

'চলো, নিচে গিয়ে দেখি কি ওটা,' বলে নামার জন্যে তৈরি হয়ে গেল লুসেটা। সঙ্গিনীর সামান্য দ্বিধাটুকু তার নজর এড়িয়ে গেল।

বাইরে আসার পর গভীর কৌতূহলে যন্ত্রটা পরখ করল ওরা।

'ভাল আছ, এলিজাবেথ-জেন?' কে একজন প্রশ্ন করতে মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। হেঞ্চার্ড।

থতমত খেয়ে গেছে এলিজাবেথ। কোনমতে তো-তো করে বলল, 'বাবা, আমি এই ভদ্রমহিলার বাসায় থাকি–এঁর নাম মিস টেম্পলম্যান।'

হ্যাটে হাত ছোঁয়াল হেঞ্চার্ড, তারপর প্রবলভাবে হাঁটু দুলিয়ে মাথা থেকে নামিয়ে আনল ওটা। বাউ করল মিস টেম্পলম্যান। 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল, মি. হেঞ্চার্ড,' বলল। 'আজব যন্ত্র, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হেঞ্চার্ড, তারপর যন্ত্রটার বর্ণনা দিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগল।

'কে আনল?' লুসেটার প্রশ্ন।

'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, ম্যাম!' বলল হেঞ্চার্ড। 'এই বিদ্‌ঘুটে জিনিস দিয়ে কি কাজ হবে আল্লা মালুম। আমাদের এক আধুনিকমনা নাগরিক কোন এক বোকা গাধার পরামর্শে এটা আনিয়েছে–' এলিজাবেথ-জেনের মিনতিপূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ করে চুপ হয়ে গেল সে। তলে তলে অনেক দূরই এগিয়েছে তাহলে, বলল মনে মনে। ঘুরে দাঁড়াল ও চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল এলিজাবেথ যার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিড়বিড় করে কিছু একটা আওড়াল হেঞ্চার্ড। এলিজাবেথের কানে যেটা শোনাল: 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করোনি!' কথা কটা তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে লুসেটার উদ্দেশে বলা। কিছুই বুঝতে পারল না ও। বাবা কি লুসেটার সাথেই কথা বলল? লুসেটা কিন্তু নিশ্চুপ। এসময় যন্ত্রটির ওপাশ থেকে ভেসে এল স্কটিশ যুবকটির গলা, যার ফলে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল মেয়েটির। হেঞ্চার্ড ইতোমধ্যে মিশে গেছে জনতার ভিড়ে।

ফারফ্রের দেখা পেতে লুসেটা আগে কথা বলল।

'জিনিসটা দেখতে দারুণ,' বলল ও। 'কিন্তু কোন কাজের নয়, ঠিক না?' হেঞ্চার্ডের তথ্যের ওপর ভর করে ঝেড়ে দিল।

'কে বলল?' গোমড়া মুখে বলল ফারফ্রে। 'দেখবেন এখানকার চাষবাসের রীতি পাল্টে দেবে এটা। বীজ ছড়ানোর আর দরকার পড়বে না। প্রতিটা দানা যাবে ঠিক যেখানে যাওয়া দরকার, আর অপচয়ও বন্ধ হবে।'

'মেশিনটা আপনার?' লুসেটা জিজ্ঞেস করল।

'না, না, ম্যাডাম,' মহিলার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, অপ্রতিভ বোধ করছে ফারফ্রে। অথচ এলিজাবেথ-জেনের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'আমি শুধু আনার প্রস্তাব করেছি।'

ফারফ্রে যেন এলিজাবেথের কথা ভুলেই গেছে। লুসেটা ছাড়া তার আর কারও প্রতি খেয়ালই নেই। বিষয়টা চোখ এড়াল না লুসেটার। যুবকের মধ্যে এমুহূর্তে ব্যবসায়িক ও রোমান্টিক অনুভূতি দ্বৈতভাবে কাজ করছে। তাই সে বলল, 'দেখবেন, আমাদের পেয়ে মেশিনের কথা ভুলে যাবেন না যেন।' সঙ্গিনীকে নিয়ে এরপর বাসায় চলে এল ও।

এলিজাবেথের খটকা লেগেছে বুঝে লুসেটা পরে ব্যাখ্যা করল, 'কদিন আগে মি. ফারফ্রের সাথে আলাপ হয়, তাই আজ যেচে কথা বললাম।'

এলিজাবেথ কিন্তু ঠিকই টের পাচ্ছে, দিনকে দিন স্কটিশ যুবকটির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে তার প্রভু।

একদিনের কথা। লুসেটা বাজার এলাকা থেকে ফিরলে এলিজাবেথ তাকে বলল, 'মি. ফারফ্রের সাথে দেখা হলো বুঝি?'

'হ্যাঁ,' বলল লুসেটা। 'কিভাবে জানলে?' হঠাৎই এলিজাবেথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার একখানা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। উত্তেজিত। মনের কিছু কথা সে জানাতে চায় এলিজাবেথকে। এলিজাবেথ সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিল।

'আমার পরিচিত এক মহিলা,' ধীরে সুস্থে শুরু করল লুসেটা, 'এক লোককে ভীষণ পছন্দ করত।'

'আচ্ছা,' উৎসাহ জোগাল এলিজাবেথ।

'খুব ঘনিষ্ঠ ছিল তারা–খুবই, তবে লোকটার চাইতে মেয়েটাই বেশি দুর্বল ছিল। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে, কৃতজ্ঞতার বশে লোকটা কথা দেয় সে মেয়েটিকে বিয়ে করবে। মেয়েটা খুশি মনে রাজি হয়, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বিয়েটা আর হতে পারেনি। মেয়েটা অনুভব করে, তার পক্ষে অন্য কোন পুরুষ-মানুষকে বিয়ে করা সম্ভব নয়–যদি কাউকে ভাল লেগে যায় তবুও। বিবেকের তাড়না আরকি। এরপর অনেক দিনের জন্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় দু'জনার, জীবনে বহুত ভোগান্তি পোহাতে হয় মেয়েটিকে।'

'আহা বেচারী!'

'লোকটার জন্যে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছে মেয়েটিকে, যদিও লোকটার এতে হাত ছিল না। পরে অবশ্য বিয়ের বাধাটা আর থাকেনি; এবং লোকটাও রাজি হয় বিয়ে করতে।'

'বাহ্!'

'কিন্তু এর মধ্যে ঘটে যায় আরেক ঘটনা। আমার বান্ধবীর ভাল লেগে যায় অন্য এক পুরুষকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার কি প্রথম জনকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে?'

'হুট করে আরেকজনকে ভাল লেগে গেল–এটা তো ঠিক হলো না।'

'হ্যাঁ,' বলল লুসেটা, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'তা হলো না! যদিও

দ্বিতীয়জনের সঙ্গে প্রথমজনের তুলনা চলে না। দ্বিতীয়জন অনেক বেশি শিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল।'

'খুব কঠিন ব্যাপার,' এলিজাবেথ চিন্তামগ্ন। 'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

লুসেটা অবশ্য মন খোলসা করে খানিকটা হালকা বোধ করছে।

'একটা আয়না নিয়ে এসো,' প্রসঙ্গ পাল্টে বলল ও। 'দেখি লোকের চোখে আমাকে কেমন দেখায়?'

'সব ঠিক আছে, চেহারায় কেবল সামান্য ক্লান্তির ছাপ।' বলে আয়না নিয়ে এল এলিজাবেথ।

লুসেটার রূপ-বয়স ইত্যাদি বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো ওদের মধ্যে। একসময় আয়নাটা নামিয়ে রেখে চুপ হয়ে গেল লুসেটা। এলিজাবেথ অবশ্য যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। লুসেটার গল্পের নায়িকা আর কেউ নয়, সে স্বয়ং।

ডোনাল্ড ফারফ্রে আবার এল হাই-প্লেস হলে। মিস টেম্পলম্যান ও এলিজাবেথ দু'জনেই তাকে স্বাগত জানালেও এলিজাবেথের উপস্থিতি শীঘ্রিই গৌণ হয়ে পড়ল। ফারফ্রে যেন তাকে চোখেই দেখছে না। মেয়েটির চোখা মন্তব্যগুলোর কাটা-কাটা জবাব দিল। যুবকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এলিজাবেথ নয়, লুসেটা।

সুসান হেঞ্চার্ডের মেয়ে মুখ বুজে সহ্য করে গেল সমস্ত অপমান-অবহেলা। যত শীঘ্রি সম্ভব বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। এই ফারফ্রে আর সেই ফারফ্রের মধ্যে আজ যেন আকাশ পাতাল দূরত্ব। এ-ই কি সেই লোক যে ওর সাথে নেচেছিল, ওকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, প্রকাশ করেছিল হৃদয় দুর্বলতা?

শোবার ঘরের জানালা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বাইরে চেয়ে রইল এলিজাবেথ। 'হ্যাঁ,' বলল আপন মনে, 'গল্পের দ্বিতীয় লোক অন্য কেউ না, এই ফারফ্রে।'

পরদিন এলিজাবেথ যখন বাইরে, হেঞ্চার্ড দেখা করতে এল লুসেটার বাড়িতে। অস্বস্তি নিয়ে মহিলার কামরায় হাজির হলো সে। এমন জমকালোভাবে সাজানো-গোছানো বাড়িতে নিজেকে বেমানান ঠেকছে তার। লুসেটা তাকে দেখা করার জন্যে ভদ্রভাবে অভিনন্দন জানাল। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল হেঞ্চার্ড।

'আমি আসব তুমি তো জানতেই, লুসেটা,' বলল। 'এতে অভিনন্দন জানানোর কি আছে? আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, আমি তৈরি আছি। তুমি যখন চাইবে বিয়েটা তখনই হতে পারে। তুমি দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেলো।'

'এত তাড়াহুড়োর কি আছে?'

'কথা ঠিক। কিন্তু, লুসেটা, সুসান মারা যাওয়ার পর এটা আমার কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি যত শিগ্‌গির পারি কাজটা সেরে ফেলতে চাই। আমি আগে আসিনি তার কারণ তোমার এখন অনেক টাকা–আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।' গলার স্বর ধীরে ধীরে নেমে এল ওর। সে জানে, তার কথাবার্তা-আচার-আচরণ এ বাড়ির উপযুক্ত নয়।.

'আমার জানা ছিল না ক্যাস্টারব্রিজে কেউ এতসব ফার্নিচার কিনতে পারে,' বলল সে।

'পারে না,' বলল লুসেটা। 'ভবিষ্যতে পারবে বলেও মনে হয় না। একটা ওয়াগন আর চারটে ঘোড়া লেগেছে এগুলো আনতে।'

'সত্যি কথা বলতে কি, তোমার বিত্ত দেখে আমি ঘাবড়ে গেছি, লুসেটা। অবশ্য এ-ও ঠিক, তোমাকে এতে মানিয়েছে খুব।' লোকটির প্রশংসায় খুশি হওয়ার বদলে সঙ্কুচিত বোধ করল লুসেটা।

'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করল লুসেটা। হেঞ্চার্ড চট করে ওর মনোভাব ধরে ফেলল।

'করলে করো না করলে না। আমার কথা এখন আর তোমার ভাল নাও লাগতে পারে। তুমি তো এখন জাতে উঠে গেছ। কিন্তু আমি যা বলি সোজা-সাপ্টা বলি, মাননীয়া লুসেটা।'

'এভাবে কথা বলছ কেন?' চোখে আগুন নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল লুসেটা।

'ঠিকই তো বলছি!' পাল্টা ঝাঁঝ দেখাল হেঞ্চার্ড। 'শোনো, আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে আসিনি। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছি, যাতে তোমার জার্সির শত্রুদের মুখ বন্ধ হয়। এজন্যে তোমার কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত।'

'তুমি এভাবে কথা বলতে পারো না!' বলল লুসেটা। 'আমাকে তুমি অনেক ভুগিয়েছ, চিঠিতে তোমাকে ভুলে যেতে বলেছিলে। এখন আমি যে স্বাধীনতাটুকু ভোগ করছি, সেটুকু আমি অর্জন করে নিয়েছি!'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করল হেঞ্চার্ড। 'কিন্তু তারপরও তোমার উচিত আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া–তোমার সুনামের স্বার্থে। তুমি কি চাও জার্সির ঘটনাটা এখানে জানাজানি হয়ে যাক?'

'জার্সির কথা তুলছ কেন? এখানে সবাই জানে আমি বাথ থেকে এসেছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকথা থাক, আমার প্রস্তাবের জবাব দাও।'

'আপাতত যেমন চলছে চলতে দাও,' অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল মহিলা। 'ভান করব, আমরা একে অন্যের অল্প পরিচিত। সময়ে সবই–' থেমে গেল ও, কিন্তু হেঞ্চার্ড শূন্যস্থান-ভরাট করল না।

'বাতাস উল্টোদিকে বইছে দেখছি,' অবশেষে মন্তব্য করল হেঞ্চার্ড। 'তুমি ক্যাস্টারব্রিজে এসেছিলে আমার জন্যে,' বলে চলল। 'অথচ এখন আমার প্রস্তাবে সাড়া দিতে চাইছ না!' দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

হেঞ্চার্ড সিঁড়ি ভেঙে খানিক দূর নামতে না নামতেই সোফায় আছড়ে পড়ল লুসেটা। 'আমি ডোনাল্ডকে ভালবাসি!' স্বগতোক্তি করল। 'হেঞ্চার্ডের মত একটা বদরাগী, কঠোর লোককে জেনেশুনে বিয়ে করতে পারি না। অতীত আঁকড়ে কেন পড়ে থাকব আমি? আমার যাকে ইচ্ছা তাকে ভালবাসব!' কিন্তু তবুও ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। হেঞ্চার্ড ভুল বলেনি, ক্যাস্টারব্রিজেও লুসেটার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হতে পারে। লুসেটার লেখা চিঠিগুলো তো ফেরত দেয়নি হেঞ্চার্ড। এতদিনে হয়তো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তারপরও স্বস্তি বোধ করতে পারল না লুসেটা। কেন যে মরতে লিখতে গিয়েছিলাম, ভাবল।

বসন্তের এক সকালে, কাকতালীয়ভাবে ডার্নোভার হিল অভিমুখী রাস্তাটায়

দেখা হয়ে গেল ফারফ্রে ও হেঞ্চার্ডের। লুসেটার লেখা একখানা চিঠি পড়ছিল হেঞ্চার্ড। লুসেটা সহসা কেন ওর সাথে দেখা করতে পারছে না তার কিছু অজুহাত দর্শিয়েছে।

ডোনাল্ড পড়ে গেল মহা মুসিবতে। না চাইছে সে হেঞ্চার্ডের সঙ্গে কথা বলতে, না পারছে নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে। সে মাথা নাড়তে, হেঞ্চার্ডও নাড়ল। একে অপরকে ছাড়িয়ে কয়েক কদম চলে গেছে, এমনি সময় হেঞ্চার্ড হেঁকে উঠল। 'ফারফ্রে! তোমার মনে আছে,' অনেকটা ঝোঁকের বশেই বলে বসল, 'আমার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে এক মহিলা খুব ভোগান্তি ভুগেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখন তাকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু সে চায় না। কিছু বুঝলে?'

'আপনাকে তার আর প্রয়োজন নেই।'

'ঠিকই বলেছ,' বলে পথ চলতে লাগল হেঞ্চার্ড।

চিঠি পড়তে পড়তে হেঞ্চার্ড প্রশ্নটা করেছে বলে ডোনাল্ডের মাথায় খেলেনি, লুসেটার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। আর হেঞ্চার্ডও ফারফ্রের মতামত পেয়ে খুশি। সে যে ওর পথের কাঁটা ওকথা মাথাতেই আসেনি।

তবে প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন গজিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লুসেটা অনবরত অজুহাত দেখিয়ে চলেছে, দেখা করছে না, তাতেই বোঝা যায়। হেঞ্চার্ড প্রতিজ্ঞা করল, সে জেনে ছাড়বে কার জন্যে তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। শেষ অবধি লুসেটার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারল।

চা খেতে বসে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল হেঞ্চার্ড, সে মি. ফারফ্রেকে চেনে কিনা।

তা চিনবে না কেন। বাজার এলাকায় বাস করলে না চিনে উপায় আছে?

'ভাল ছেলে,' মন্তব্য করল হেঞ্চার্ড।

'হ্যাঁ।'

'আমিও তো চিনি তাকে,' বলল এলিজাবেথ-জেন, মনিবের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে তাকে সহজ করতে চাইল।

দরজায় এসময় টোকার শব্দ হলো।

'ওই এল বুঝি,' মেয়র জনান্তিকে বলল। দু'মুহূর্ত বাদে, সত্যি সত্যি ডোনাল্ড পা রাখল ভেতরে।

লুসেটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে, এর ফলে সন্দেহ বদ্ধমূল হলো হেঞ্চার্ডের।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাশাপাশি বসল দু'জনে, উল্টোদিকে লুসেটা। আর এলিজাবেথ-জেন পেছন থেকে সবার ওপর দৃষ্টি রাখছে।

'রুটি-মাখন নিন?' অতিথিদের উদ্দেশে বলে একটা থালা বাড়িয়ে ধরল লুসেটা। এক টুকরো রুটির একটা কিনারা ধরল হেঞ্চার্ড, আর অপরটা ডোনাল্ড। দু'জনেই ভেবেছে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, কেউ ছাড়ল না, ফলে টুকরোটা দু'ভাগ হয়ে গেল।

'এই য্যাহ্!' বিরস হাসি হেসে বলল লুসেটা।

'তিনটাই পাগল!' এলিজাবেথ নিজের মনে বলল।

সাত

ফারফ্রেকে তাড়ানোর পর থেকে আরেকজন ম্যানেজারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে হেঞ্চার্ড। জপকে খবর দেবে ঠিক করল সে। ফারফ্রে এসে পড়ায় চাকরিটা হারায় জপ। প্রায়ই রাস্তা-ঘাটে দেখা পাওয়া যায় লোকটির। হেঞ্চার্ডের জানা আছে, জপ এখন বেকার। একটা চিরকুট পাঠানো হলো তার বাসায়।

জপ এল সন্ধের পর। হেঞ্চার্ড অফিসে বসে ছিল ওর অপেক্ষায়। চাকরি সাধতে তখুনি রাজি হয়ে গেল লোকটি।

হেঞ্চার্ডের ব্যবসার হাল-চাল ভালভাবেই জানা আছে জপের। এ-ও তার জানা, জার্সিতে কারবার আছে হেঞ্চার্ডের এবং লুসেটা বাথ থেকে নয়, জার্সি থেকে এসেছে। জার্সিতে সে যে অনেকবারই হেঞ্চার্ডকে দেখেছে ও কথা জানাতেও ভুল করল না।

'তাই নাকি! তবে তো ভালই হলো, আপনার সবই জানা আছে। এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিন।' জপের মুখের ওপর স্থির হলো তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'একটা ব্যাপার আমার কাছে খুবই জরুরী। সেটা হলো, ওই স্কটিশ লোকটার বড় বাড় বেড়েছে–ওকে ব্যবসায় মার খাওয়াতে হবে। শুনেছেন? এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না–এটা পরিষ্কার জেনে রাখবেন।'

'আমি সবই জানি,' বলল জপ।

'সুস্থ প্রতিযোগিতা চাই আমি,' কথার খেই ধরল হেঞ্চার্ড। 'এবং বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। সব শস্য কিনে নিয়ে ওকে দাবিয়ে দেব আমরা–না খাইয়ে মারব। জানেনই তো, আমার টাকার অভাব নেই, এবং চাইলে কাজটা পারবও।'

'তা তো বটেই,' বলল নবাগত। হেঞ্চার্ডের চেয়ে কম ঘৃণা করে সে ফারফ্রেকে? ওকে অন্যায়ভাবে ডিঙিয়ে ব্যাটা এখানে ম্যানেজারি করে গেছে না? সে জ্বালা কি এত সহজে ভোলা যায়!

এখন অবধি এ মৌসুমের যা আবহাওয়া, এতে ওদের কার্যসিদ্ধি হতে পারে। আবহাওয়া এবার বড়ই খারাপ। জপের সঙ্গে আলোচনা করে হেঞ্চার্ডের ধারণা হলো, ফসল এবছর কম হবে। কিন্তু হেঞ্চার্ড এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়। এমন একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল সে, জপকেও যা জানাল না।

শহর ছাড়িয়ে ক'মাইল দূরে নিরিবিলি এক গাঁ। ওখানে বাস করে এক দৈবজ্ঞ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলার ক্ষমতা রাখে সে। আঁকাবাঁকা, স্যাঁতসেঁতে, আঁধার এক রাস্তা দিয়ে ওর কুটিরে যেতে হয়। এক সন্ধের কথা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় লোকজন নেই। হেঞ্চার্ড এমনভাবে গায়ে পোশাক চড়াল, ওকে যাতে চেনা না যায়। এবার বেরিয়ে পড়ল ভবিষ্যদ্বক্তার কুটিরের উদ্দেশে।

ওর টোকার শব্দে কুটিরবাসী দোরগোড়ায় উদয় হলো, মোমবাতি হাতে।

'আপনার সাথে কথা বলতে পারি?' আগন্তুক অর্থপূর্ণ স্বরে বলল। 'আপনার কেরামতির প্রশংসা শুনে এসেছি।'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন, মি. হেঞ্চার্ড,' বলল লোকটা।

'আমাকে ওনামে ডাকলেন কেন?' হকচকিয়ে গেছে আগন্তুক।

'কারণ ওটাই তো আপনার নাম। আপনি আসবেন আমি জানতাম।'

'তারমানে এসে দেখছি ভুল করিনি···এখন বলুন দেখি, আপনি আবহাওয়ার কথা আগেভাগে বলতে পারেন কিনা?'

'তা পারি বৈকি।'

'তাহলে এটা রাখুন,' বলল হেঞ্চার্ড। একটা স্বর্ণ মুদ্রা গুঁজে দিল লোকটার হাতে। 'ফসল কাটার পনেরো দিন আবহাওয়া কেমন থাকবে জানতে চাই আমি।'

'আমি তা আগেই গুনে রেখেছি, এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি।' (আসল ঘটনা হচ্ছে, আশপাশের এলাকা থেকে ইতোমধ্যেই পাঁচজন কৃষক একই উদ্দেশ্যে ওর কাছে এসে গেছে।) 'চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের অবস্থান, মেঘ, বাতাস, গাছ-পালা, ঘাস, পাখি আর ভেষজের ঘ্রাণ বিচার-বিশ্লেষণ করে; বেড়ালের আর মাকড়সার চোখ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একথা ঘোষণা করছি, আগস্টের শেষ পনেরো দিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

'নিশ্চিত করে বলছেন না নিশ্চয়ই?'

'এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে যতখানি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব, আমি ঠিক ততখানিই নিশ্চিত।'

পরের শনিবার হেঞ্চার্ড এতটাই বেশি শস্য কিনে রাখল, শহরে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গেল। পুরো জুলাই মাস জুড়ে বিশ্রী আবহাওয়া গেল। যতটা সম্ভব ঠেসে সব কটা শস্য গোলা ভরে তুলল হেঞ্চার্ড। তার পর পরই ঠিক উল্টো দিকে মোড় নিল আবহাওয়া।

ব্যাপারটা মারাত্মক আঘাত হয়ে দেখা দিল জেদী শস্য বণিকের জন্যে। কারবার এতটাই বাড়িয়ে ফেলেছে সে, টাকায় যার ফলে টান পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে ক'দিন আগে কেনা শস্য বিক্রি করতে শুরু করল সে পানির দরে, এবং বলাবাহুল্য প্রচুর লোকসান দিতে লাগল।

আগস্টের গোড়ার দিকের এক দিন। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। হাট এলাকায় ফারফ্রের সঙ্গে দেখা হলো হেঞ্চার্ডের। ফারফ্রে হেঞ্চার্ডকে ব্যবসায়িক ক্ষতির জন্যে সহানুভূতি জানাল। তার অবশ্য জানা নেই, তাকে দাবানোর ইচ্ছেতেই ও কাজ করেছিল হেঞ্চার্ড।

ফারফ্রের ওপর প্রথমটায় প্রায় খেপে উঠলেও পরে হেসে উড়িয়ে দিল হেঞ্চার্ড। লোকসান হয়েছে তো কি হয়েছে, কারবারে অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে। তার ভাবখানা এমন, যেন পরোয়াই করে না।

কিন্তু মুখে ও কথা বললে কি হবে, তাকে পরদিন ক্যাস্টারব্রিজ ব্যাঙ্কে প্রবেশ করতে হলো। এমন সব কারণে যা আগে কখনও উদয় হয়নি। ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার প্রাইভেট অফিসে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে ব্যাখ্যা করতে হলো পরিস্থিতি। পরে কিছুদিনের মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে, হেঞ্চার্ডের বেশিরভাগ সম্পত্তি ব্যাঙ্কের

দখলে চলে গেছে।

ব্যাঙ্কের সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে, জপকে দেখতে পেল। কোন্ এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে। 'সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন, কি বলো?' ম্যানেজার সবে বলেছে কি বলেনি অমনি হেঞ্চার্ড এসে হাজির।

'তা তো বলবেনই! সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন, অ্যাঁ?' দাঁতের ফাঁকে বলল হেঞ্চার্ড। 'আপনি কুবুদ্ধি না দিলে দিনটা আমিও উপভোগ করতে পারতাম। আমাকে তখন বাধা দেননি কেন?–আপনি একটু মুখ খুললেই তো আমি একবারের জায়গায় দু'বার ভাবতাম!'

'আমি কি আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি, স্যার?'

'ভালই বলেছেন! এক কাজ করুন, যত শিগ্‌গির পারেন আর কাউকে ওভাবে সাহায্য করুনগে যান!' হেঞ্চার্ড চড়া গলায় ধমকে চলল জপকে, এবং এক পর্যায়ে বরখাস্ত করল চাকরি থেকে।

'আপনাকে এজন্যে পস্তাতে হবে, স্যার। কতখানি সেটা পরে টের পাবেন!' বলে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে রইল জপ। শস্য ব্যবসায়ীকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জনতার ভিড়ে মিশে যেতে দেখল। গাড্ডা থেকে ওঠার জন্যে হেঞ্চার্ড যখন নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার করে শস্য বেচে চলেছে, চেষ্টা করছে ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে, ফারফ্রে তখন হৈ চৈ না করে নীরবে শস্য কিনেই যাচ্ছে।

এরপর শুরু হলো ফসল কাটার মৌসুম। চমৎকার তিনটি রোদেলা দিনের পর–'ওই খচ্চর ভবিষ্যদ্বক্তার কথা এখন ফললেই বা কি?' ক্ষোভ প্রকাশ করল হেঞ্চার্ড।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, চতুর্থ দিন কাজ শুরু হতে না হতেই বাতাস দিল, মেঘ জমে ঢল নামল বৃষ্টির। সেদিন থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল, এবারের মৌসুম খতম। হেঞ্চার্ড যদি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত, তাহলে লাভ করতে না পারলেও লোকসানটা ঠিকই এড়াতে পারত। কিন্তু ধৈর্য কিংবা সহিষ্ণুতা বলে কোন কিছু তো তার চরিত্রের মধ্যেই নেই।

ওদিকে ডোনাল্ড ফারফ্রে এই সুযোগে লালে লাল হয়ে গেল।

'শীঘ্রিই মেয়রও হয়ে যাবে!' আপন মনে বলে হেঞ্চার্ড। ওদের শত্রুতা দু'জনের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকল না, ছড়িয়ে পড়ল দু'পক্ষের কর্মচারীদের মধ্যেও।

হেঞ্চার্ড এরমধ্যে একদিন ঠিক করল, লুসেটার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সে মহিলার তরফ থেকে যদিও কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ওই বাড়ির দরজায় টোকা দিতে তাকে জানানো হলো, এখন দেখা হবে না। কেননা বাইরে যাচ্ছে লুসেটা। হেঞ্চার্ড তার ওয়াগনের কাছে ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, ভাবনা চলছে তার মাথায়। এসময় ফারফ্রেকে যেতে দেখল লুসেটার বাড়ির দরজায়। ও আসবে জানা ছিল, ফলে লুসেটা ত্বরিত বেরিয়ে এসে রওনা দিল যুবকের সঙ্গে। হেঞ্চার্ডকে তারা লক্ষই করল না। হেঞ্চার্ডের বদ্ধমূল ধারণা, ওরা ফসল কাটার কাজ দেখতে যাচ্ছে। সে ওদের পিছু নিল।

গোটা ক্যাস্টারব্রিজ এখন এ কাজে ব্যস্ত। শুষ্ক দিনে, চাঁদের আলোতেও কাজ

করছে সবাই।

হেঞ্চার্ড লক্ষ করল, ডোনাল্ড ও লুসেটা কর্মচারীদের মাঝ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। সহসাই ওরা ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। এখন দেখা হয়ে গেলে অস্বস্তিতে পড়তে হবে, ফলে চট করে পিছিয়ে খেতের এক কিনারে চলে এল হেঞ্চার্ড। গা ঢাকা দিল ঝোপের আড়ালে।

'কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন,' খোশমেজাজে বলছে লুসেটা। 'আমি শুনছি।'

'বেশ,' গদগদ কণ্ঠে বলল ফারফ্রে, প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বুঝতে বেগ পেতে হয় না। 'আপনার সামাজিক মর্যাদা, সম্পদ, রূপ-গুণ অনেককে আকৃষ্ট করবে। আপনি কি ভক্তদের সবাইকে বঞ্চিত করে অতি সাধারণ একজনকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারবেন?'

'সেই সাধারণ একজনটা কে, আপনি নিজে নাকি, সাহেব?' হাসতে হাসতে বলল লুসেটা। 'থামলেন কেন, বলুন।'

'আমার এমন অবস্থা, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

এরপর কি সব ভাঙা ভাঙা শব্দ আওড়াল লুসেটা, হেঞ্চার্ডের কান পর্যন্ত পৌঁছল না। 'আপনি হিংসে করবেন না তো?' যোগ করল শেষে।

ফারফ্রে হিংসে করবে না বোঝাতে লুসেটার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

'এটা জানবেন, আমি অন্য কাউকে ভালবাসি না,' বলল লুসেটা। 'কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে আমি স্বাধীনতা চাই।'

'সব ব্যাপারে চাইলেই বা আপত্তি কিসের! একথা বলে বিশেষ কোন কিছু কি বোঝাতে চাইছেন?'

'আমার যদি চিরদিন এই ক্যাস্টারব্রিজে ভাল না লাগে, এখানে যদি আমি সুখী না হই তখন?'

জবাবটা কানে এল না হেঞ্চার্ডের। তার আর আড়িপাতার প্রয়োজন নেই। প্রেমিকযুগল শ্রবণসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে যাক। একটু পরে, বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। ফারফ্রে এগিয়ে গেল এক কৃষকের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে, আর লুসেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হলো।

হেঞ্চার্ড অনুসরণ করল ওকে। ওর মনের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, লুসেটার বাড়ির দরজায় পৌঁছে, টোকা না দিয়েই ধাক্কা দিয়ে খুলে প্রবেশ করল ভেতরে। সোজা উঠে এল মহিলার সিটিং-রূমে।

প্রথমটায় ওকে লক্ষ করেনি লুসেটা। কামরাটা প্রায়ান্ধকার। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে সে। অনাহূত অতিথিকে লক্ষ করা মাত্র আতঙ্কে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

'আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে কেন?' মুখ টকটকে লাল, চেঁচিয়ে উঠল ও। 'দশটা বেজে গেছে, এই অসময়ে কোন্ অধিকারে এসেছ?'

'অধিকারের প্রশ্ন তুলছ? আসার নিশ্চয়ই একটা অজুহাত আছে আমার। আমাকে কি এখন কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক তা নিয়ে মাথা ঘামাতে

বলো?'

'অনেক রাত হয়েছে, লোকে নানান কথা রটাবে।'

'আমি এক ঘণ্টা আগে দেখা করতে এসেছিলাম, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। অন্যায় যদি কেউ করে থাকে সেটা তুমি করছ, লুসেটা। আমাকে এভাবে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো না। তুমি বোধহয় একটা কথা ভুলে গেছ।'

চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল মহিলা, মুখ মড়ার মত সাদা।

'আমি শুনতে চাই না–শুনতে চাই না!' দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে বলল লুসেটা। লোকটা ওর গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বলতে শুরু করেছে জার্সির দিনগুলোর কথা।

'তোমাকে শুনতে হবে।' ঘোষণা করল হেঞ্চার্ড।

'যত যা-ই বলো কোন সম্পর্ক তো হয়নি, এবং সেজন্যে তুমি দায়ী। কম কষ্ট তো করিনি, এখন আমাকে একটু আমার মত থাকতে দাও! আমাকে ভালবেসে যদি বিয়ে করতে চাইতে তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তুমি বিয়ে করতে চাও কর্তব্যবোধের তাগিদে। এর ফলে আমার মন শক্ত হয়ে গেছে। আমি আর আগের মত তোমার কথা ভাবি না।'

'আমাকে তবে শহরে খুঁজতে এসেছিলে কেন?'

'এসেছিলাম বিবেকের দংশনে। মনে হয়েছিল আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত। তোমাকে ভালবেসে তো আসিনি।'

'তাহলে এখন হঠাৎ মত বদলে গেল কেন জানতে পারি?'

চুপ হয়ে গেল লুসেটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিবেকবোধ এখন শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে, হাজার হলেও নতুন প্রেমের কুঁড়ি ফুটেছে যে। ও কেবল এটুকু বলতে পারল, 'আমার তখন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই, ফলে আমি মানুষটাও বদলে গেছি।'

'সত্যি কথা। আর এরজন্যে বেকায়দায় পড়েছি আমি। কিন্তু আমি তোমার টাকা ছুঁয়েও দেখব না। তোমার প্রতিটা পাই-পয়সা তোমারই থাকবে। তোমার সম্পত্তি তুমিই ভোগদখল করবে। আসলে এসব তো কোন কারণ নয়, খোঁড়া যুক্তি। যে লোকের কথা কল্পনা করছ সে কোন দিক দিয়েই আমার চেয়ে ভাল নয়।'

'তুমি এতই যদি ভাল তাহলে আমাকে বিরক্ত করছ কেন? ভুলে যেতে পারো না!'

লুসেটার মুখে কড়া কথা শুনে রেগে উঠল হেঞ্চার্ড। 'আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারো না,' বলল সে। 'তুমি যদি আজ রাতে একজন সাক্ষীর সামনে আমার প্রস্তাবে রাজি না হও, তাহলে কিন্তু আমাদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে যাবে!'

পরাজিত মানুষের অভিব্যক্তি লুসেটার চোখে-মুখে। ওর অন্তরের তিক্ততা স্পষ্ট টের পেল হেঞ্চার্ড। লুসেটা যদি ফারফ্রেকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে ভালবাসত, ওর প্রতি সহানুভূতি অনুভব করত হেঞ্চার্ড। কিন্তু এক্ষেত্রে দয়া কিংবা করুণা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

টুঁ শব্দটি না করে মেইডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল লুসেটা, এলিজাবেথ-জেনকে নিয়ে আসতে বলল ওর কামরা থেকে। মেয়েটি এ ঘরে এসে হেঞ্চার্ডকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

'এলিজাবেথ-জেন,' ওর একটা হাত ধরে বলল হেঞ্চার্ড, 'কথাগুলো শুনে রাখো।' এবার ফিরে চাইল লুসেটার দিকে: 'তুমি আমাকে বিয়ে করছ, নাকি করছ না?'

'তুমি যদি চাও–আমাকে রাজি হতে হবে।'

'তুমি রাজি?'

'হ্যাঁ।'

প্রতিশ্রুতি দিতে না দিতেই মূর্ছা গেল লুসেটা।

'ওঁকে মনের বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য কোরো না, বাবা,' লুসেটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলল এলিজাবেথ। 'দেখছ না কত কষ্ট হচ্ছে ওঁর? আমি তো চিনি ওঁকে, মনটা খুব নরম ওঁর।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' শুকনো গলায় বলল হেঞ্চার্ড। 'ও আমাকে বিয়ে করলে তোমার রাস্তা খুলে যায়, চাইলে ওই লোকটাকে এখন পেতে পারো তুমি।'

এ কথায় যেন চমকে চেতনা ফিরে পেল লুসেটা। 'ওই লোকটা মানে? কার কথা বলছ তোমরা?' বুনো গলায় কৈফিয়ত চাইল।

'কারও না,' দৃঢ় কণ্ঠে জানাল এলিজাবেথ। 'সে গুরুত্বপূর্ণ কেউ না।'

'ও, আমার তবে বোঝার ভুল হয়েছে,' বলল হেঞ্চার্ড। 'কিন্তু এটা আমার আর মিস টেম্পলম্যানের ব্যাপার। সে আমার স্ত্রী হতে রাজি হয়েছে।'

'এখন ওসব কথা না বললেই কি নয়?' মিনতি করল এলিজাবেথ।

'ও কথা দিলে এসব কে বলতে যেত?' বলল হেঞ্চার্ড।

'দিচ্ছি, দিচ্ছি,' গুঙিয়ে উঠল লুসেটা। 'মাইকেল, দয়া করে ও নিয়ে আর কথা বোলো না!'

'বলব না,' বলল হেঞ্চার্ড। হ্যাট তুলে নিয়ে চলে গেল।

এলিজাবেথ-জেন তখনও লুসেটার পাশে তেমনিভাবে বসা। 'ব্যাপারটা কি?' বলল। 'আপনি আমার বাবাকে মাইকেল বলে ডাকলেন যে? ওঁকে আগে থেকেই চিনতেন নাকি? আর আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে মত দিতে হচ্ছে, আপনার ওপর এতটা প্রভাব উনি পেলেন কিভাবে? ও–অনেক কিছুই আমার কাছে গোপন করেছেন দেখছি!'

'হয়তো কিছু কিছু তুমিও করেছ,' চোখ বুজে বিড়বিড় করে আওড়াল লুসেটা, ফারফ্রের প্রতি এলিজাবেথের দুর্বলতার কথাই সে বোঝাতে চেয়েছে।

'আমি কখনোই আপনার বিরুদ্ধে যাব না,' আবেগ চাপা দিয়ে বলল এলিজাবেথ। 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, আমার বাবা কেন এভাবে আপনার ওপর চাপ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি ওঁর কাছে যাব, বলব আপনাকে যাতে বাধ্য না করেন।'

'না, না,' বলল লুসেটা। 'যেমন চলছে চলুক।'

পরদিন সকালে, হেঞ্চার্ড গেল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। ছিঁচকে অপরাধীদের বিচার হয় এখানে। হেঞ্চার্ড বিচারকদের একজন। আজ মামলা মাত্র একটা। অপরাধী তার সামনে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধা এক মহিলা, পরনে নোংরা হতশ্রী পোশাক। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পেল্লায় এক অ্যাপ্রন তার গায়ে, বোঝা যায় এককালে কাপড়টা সাদা রঙের ছিল। মহিলা স্থানীয় কেউ নয়।

হেঞ্চার্ড ও দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশে চেয়ে রইল বুড়ী। হেঞ্চার্ডও এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিল তার ওপর। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে যেন খেলে গেল পুরানো কোন স্মৃতি। অস্পষ্টভাবে। 'হ্যাঁ, তা কি করেছে ও?'

'মাতলামি করার দায়ে ধরে আনা হয়েছে, স্যার,' বলল কনস্টেবল।

'কোথায় মাতলামি করেছে?' অপর ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করল।

'গির্জার কাছে, স্যার।'

পুলিস লোকটি সাক্ষ্য দিল, এবার বুড়ীর পালা। 'কনস্টেবলকে তোমার কোন প্রশ্ন করার আছে?' জানতে চাইল হেঞ্চার্ড।

'হ্যাঁ,' জানাল বৃদ্ধা। 'বিশ বছর আগে ওয়েডন-প্রায়র্সের মেলায় ফার্মিটি বিক্রি করছিলাম আমি–'

হেঞ্চার্ড একদৃষ্টে চেয়ে।

'এসময় এক স্বামী-স্ত্রী তাদের কোলের বাচ্চাকে নিয়ে আমার তাঁবুতে আসে,' কথার সুতো ধরল মহিলা। 'ওরা এক বাটি করে ফার্মিটি নেয়। লোকটার পাত্রে রাম দিই আমি, সে অল্পে সন্তুষ্ট হয় না, আরও নিতে থাকে। শেষমেশ বউয়ের সাথে ঝগড়া করে তাকে বিক্রি করে দেয় এক লোকের কাছে। এক নাবিক পাঁচ গিনি দিয়ে কিনে নেয় যুবতীকে। যে লোক ওভাবে নিজের স্ত্রীকে বিক্রি করে দিয়েছিল সে এখন ওই বড় চেয়ারটাতে বসে আছে।' বক্তা হেঞ্চার্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে দু'বাহু ভাঁজ করল।

সবার দৃষ্টি এসে স্থির হলো হেঞ্চার্ডের ওপর। মুখের চেহারা পাল্টে গেছে তার, ছাই বর্ণ ধারণ করেছে।

'তোমার জীবন কাহিনী শোনার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই,' শাণিত কণ্ঠে বলল দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ভরাট করে দিল অস্বস্তিকর নীরবতা। 'তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে বলো।'

'আমি বলতে চাই ও কোন দিক থেকেই আমার চেয়ে ভাল নয়, এবং ওখানে বসে আমার বিচার করার কোন অধিকার ওর নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলো,' অপর ম্যাজিস্ট্রেট হুঙ্কার ছাড়ে। 'মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাও না–'

'না, ও সত্যি কথাই বলেছে।' কথাগুলো বেরোল হেঞ্চার্ডের মুখ দিয়ে। 'দিবালোকের মত সত্য,' ধীরে ধীরে বলল। 'আর এতে প্রমাণ হয় আমি ওর চাইতে কোন দিক দিয়ে বড় নই! আমি প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে কিছু করতে চাই না, ওর বিচারের দায়িত্ব তাই আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

আদালতকক্ষে শোরগোল পড়ে গেল। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে এল হেঞ্চার্ড, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মাঝখান দিয়ে পথ করে

নিল। দেখে মনে হলো, বৃদ্ধা ফার্মিটি বিক্রেতা এ শহরে আসার পর থেকেই কাজে নেমে পড়ে, লোকের কাছে হেঞ্চার্ড সম্পর্কে বিশেষ কোন ইশারা-ইঙ্গিতও করেছে।

'আদালতের কাছে আজ এত মানুষ কেন?' পরে লুসেটা তার ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল।

'ওহ, ম্যাম, আপনি শোনেননি? এক বুড়ী মি. হেঞ্চার্ডের থলের বেড়াল বের করে দিয়েছে। ভদ্রলোক সাজার আগে উনি নিজের স্ত্রীকে বেচে দিয়েছিলেন–এক মেলার মাঠে, পাঁচ গিনির বিনিময়ে।'

অবাক হয়ে গেল লুসেটা। হেঞ্চার্ড স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের আসল কারণটা কোনদিন জানায়নি ওকে। এতদিনে সেটা জানা গেল।

দুঃখে ছেয়ে গেল লুসেটার অন্তর, কাল রাতে লোকটির জবরদস্তিমূলক প্রতিশ্রুতি আদায়ের কথা ভেবে। এই তো হেঞ্চার্ডের আসল রূপ। ওহ, কী ভয়ঙ্কর কথা, শীঘ্রিই বাজে লোকটার খপ্পরে চলে যাচ্ছে সে। লুসেটা মনস্থির করল, এখুনি ক্যাস্টারব্রিজ ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে চলে যাবে। কিছু আয়োজন করে, আর কয়েক জায়গায় ঢুঁ মেরে আসার পর সে এলিজাবেথ-জেনকে জানাল, সমুদ্র তীরবর্তী পোর্ট-ব্রেডিতে ক'দিনের জন্যে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছে। ক্যাস্টারব্রিজ নাকি বড্ড নিরানন্দময় লাগছে তার কাছে।

এর ক'দিন বাদে হাই-প্লেস হলে দেখা করতে এসে হেঞ্চার্ড জানল, কেউ বাড়ি নেই। গৃহকর্ত্রী সেদিনই ফিরছে পোর্ট-ব্রেডি থেকে, আর এলিজাবেথ-জেন গেছে তাকে স্বাগত জানাতে। তথ্যটা জেনে হেঞ্চার্ড ঠিক করল, সে-ও পোর্ট-ব্রেডির রাস্তায় যাবে।

দুই মহিলার সঙ্গে যথাসময়ে দেখা হয়ে গেল ওর। রাস্তার ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে, লক্ষ করল নিচে একটা বাঁধনখোলা ষাঁড় ভয় দেখাচ্ছে লুসেটা ও এলিজাবেথকে। ধেয়ে নেমে গেল ও, ষাঁড়টা মহিলাদের সত্যিকার কোন ক্ষতি করে বসার আগেই। বিপদ কেটে যেতে লুসেটা অন্ধ আবেগে ঢলে পড়ল হেঞ্চার্ডের বুকের ওপর। 'আমাকে জানে বাঁচিয়েছ!' কথা বলার শক্তি ফিরে পেতেই বলে উঠল।

'তুমিও তো একবার বাঁচিয়েছিলে আমাকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড।

'তুমি এখানে এলে কিভাবে?' জবাবটা না শুনেই বলল লুসেটা।

'তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম। ক'দিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলব বলব ভাবছি, কিন্তু তুমি তো ছিলে না। এখন কি তোমার কথা বলার সুযোগ হবে?'

'ওহ, না! এলিজাবেথ কোথায় গেল?'

'এই যে এখানে!' খোশমেজাজে বলল এলিজাবেথ, ওদের উদ্দেশে এগিয়ে এল।

হেঞ্চার্ড ও এলিজাবেথ দু'পাশ থেকে ধরল লুসেটাকে, চড়াই বেয়ে ধীরপায়ে উঠতে লাগল ওপরে। সবে চুড়োয় উঠেছে, অনেকটাই সামলে নিয়েছে লুসেটা, এমনিসময় তার মনে পড়ল, ষাঁড়ের ধাওয়া খেয়ে পেছনে কোথাও পশমের দস্তানা ফেলে এসেছে।

'আমি যাচ্ছি,' বলে উতরাই ভেঙে নেমে গেল এলিজাবেথ। দস্তানা খুঁজে পাওয়ার পর সে লক্ষ করল, সবজে-কালো এক এক্কাগাড়ি পোর্ট-ব্রেডি থেকে এদিকেই আসছে। ওটা চালাচ্ছে ডোনাল্ড ফারফ্রে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো, একই দিনে একই জায়গা থেকে ফিরছে কেন লুসেটা ও ফারফ্রে? তবে কোন প্রশ্ন করল না ও। ফারফ্রেকে এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা জানাল। সব শুনে যুবক এতটাই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল, এলিজাবেথ-জেনকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার কথা ভুলেই গেল। দুঃখের হাসি হেসে মাথা নাড়ল এলিজাবেথ, লুসেটা ছাড়া ফারফ্রে এখন আর কিছুই বোঝে না। যাই হোক, গাড়ি চেপে রওনা হলো ওরা।

ওদিকে, হেঞ্চার্ড ও লুসেটা হেঁটে চলেছে ক্যাস্টারব্রিজের দিকে।

'লুসেটা,' এক সময় বলল হেঞ্চার্ড, 'তোমাকে আমি হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম। বিয়ের কথাটা নিয়ে এ ক'দিন অনেক ভেবেছি। দেখলাম, জোর করে কারও মত আদায় করা অনুচিত। আমার মনে হয়, আমরা বিয়ের চিন্তা আগামী দু'এক বছর না করলেও পারি।'

'কিন্তু–কিন্তু–আমি যদি অন্য কিছু ভাবি?' আমতা আমতা করে বলল লুসেটা। 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ–তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। আমি যদি তার প্রতিদান দিতে চাই–আমার তো এখন অনেক টাকা।'

হেঞ্চার্ড ভাবমগ্ন হলো। সে এটা আশা করেনি। 'একটা কাজ অবশ্য তুমি করতে পারো, লুসেটা,' বলল।

'কি কাজ?' উদ্বেগের ছায়া লুসেটার মুখের চেহারায়।

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ব্যবসায় এ বছর দারুণ মার খেয়ে গেছি আমি। জুয়া খেলতে গেছিলাম ঠকে গেছি।'

'টাকা ধার চাইছ?'

'না, না!' প্রায় রেগে উঠে বলল হেঞ্চার্ড। 'কোন মহিলার কাছ থেকে টাকা ধার নেব না। সে যতই আপন হোক না কেন। না, লুসেটা, তুমি যা করতে পারো সেটা বলছি শোনো। মি. গ্রাওয়ারের কাছে আমার দেনাটা বেশি, কিন্তু তিনি যদি আর দুটো সপ্তাহ অপেক্ষা করেন, সামলে নিতে পারব আমি। এখন তুমি যদি তাঁকে কোনভাবে জানিয়ে দাও আগামী পনেরো দিনের মধ্যে তুমি আমাকে বিয়ে করছ–দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি! তাঁকে শুধু কথাটা বিশ্বাস করাতে পারলেই চলে, আমাদের এনগেজমেন্ট যখন খুশি হোকগে। ওঁকে বলতে হবে বিয়ের কথাটা যেন গোপন রাখেন। ব্যস, পনেরো দিন পর টাকাটা মিটিয়ে দেব আর তাঁকে জানাব বিয়েটা আপাতত হচ্ছে না। শহরের কেউ জানল না তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। আমাকে সাহায্য করতে চাইলে এভাবে করতে পারো।'

হেঞ্চার্ড তার বক্তব্য শেষ করার আগে লুসেটার মনোভাব লক্ষ করেনি।

'অন্য কিছু হলে এক কথা ছিল,' বলতে শুরু করল মহিলা, ঠোঁটের শুষ্কতা তার কণ্ঠে ভর করল।

'কিন্তু এটা এমন কি ব্যাপার!' বলল হেঞ্চার্ড। 'তুমি তো বিয়ে বসতেও রাজি ছিলে!'

'তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল না–কিন্তু আমি নিরুপায়,' দুর্দশা স্পষ্ট ওর গলার সুরে। 'আমি পারছি না!'

'কেন?'

'কারণ এই ভদ্রলোক সাক্ষী ছিলেন!'

'সাক্ষী? কিসের?'

'আমার বিয়ের–মি. গ্রাওয়ার আমার বিয়ের সাক্ষী ছিলেন!'

'তোমার বিয়ে মানে?'

'বিয়ে মানে বিয়ে। মি. ফারফ্রের সাথে। ও, মাইকেল, আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। এই সপ্তাহে পোর্ট-ব্রেডিতে বিয়ে হয়েছে আমাদের। মি. গ্রাওয়ার তখন ওখানে ছিলেন, তাই তাঁকে সাক্ষী করা হয়।'

নিথর দাঁড়িয়ে পড়ল হেঞ্চার্ড। 'ওকে বিয়ে করে ফেলেছ?' বলল অবশেষে। 'অথচ তোমার আমাকে বিয়ে করার কথা?'

'ব্যাপারটা এভাবে ঘটেছে,' অশ্রুসজল চোখে ব্যাখ্যা করল লুসেটা। 'আমি ওকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি যদি ওকে অতীতের কথা বলে দাও। তারপর তো তোমাকে কথা দেয়ার পর জানতে পারলাম, তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে গরু-ছাগলের মত বেচে দিয়েছিলে–কোথাকার এক মেলার মাঠে। ওকথা শোনার পর কেউ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে? আমি কোন্ ভরসায় নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দেব বলো? অমন একটা কেলেঙ্কারির পর তোমার ঘরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এ-ও জানতাম, বেশি দেরি করে ফেললে আমি ডোনাল্ডকে হারাব। কেননা, তুমি আমাকে পাওয়ার জন্যে ওর কাছে আমাদের পুরানো সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দিতে। এখন নিশ্চয়ই ওকাজ করতে যাবে না তুমি? আমাদেরকে যেহেতু এখন আর আলাদা করতে পারবে না।'

'ভণ্ড মেয়েমানুষ কোথাকার! আমাকে কথা দিয়েছিলে তুমি!' ক্ষোভে ফেটে পড়ল হেঞ্চার্ড।

'ওভাবে বোলো না, মাইকেল–আমাকে একটু করুণা করো!'

'তুমি করুণা পাওয়ার যোগ্য নও! আগে যদিও বা পেতে পারতে, কিন্তু এখন আর নয়।'

'তোমাকে দেনা শুধতে সাহায্য করব আমি।'

'ঋণী থাকব ফারফ্রের বউয়ের কাছে–জীবনেও না! আমার সামনে থেকে চলে যাও, কি বলতে কি বলে বসব। যাও, যাও!'

ঝড়ের বেগে বাড়ি ফিরে এল লুসেটা। স্বামী ফিরে আসার আগেই তাকে মনের শান্ত-সংযত ভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা চিন্তা মাথায় আসতে সাহস পেল সে: এখন যা-ই ঘটুক না কেন, ফারফ্রে তার।

'একটা কাজ বাকি আছে,' ডোনাল্ডকে ষাঁড়ের কাহিনী জানিয়ে তার পরে বলেছে লুসেটা। 'আমাদের বিয়ের খবরটা এলিজাবেথ-জেনকে এখনও জানানো হয়নি।'

'তাই নাকি?' চিন্তামগ্ন শোনাল ডোনাল্ডের কণ্ঠ। 'আমি ওকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছি বটে, তবে আমিও বলিনি।'

'যাই দেখি ওর ঘরে। আচ্ছা, ডোনাল্ড, ও এখানে বাস করলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'আরে না,' জবাব দিল ফারফ্রে, খানিকটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতে। 'কিন্তু ও যদি থাকতে না চায়?'

'তা চাইবে,' সাগ্রহে বলল লুসেটা। 'বেচারীর তো কোন যাওয়ার জায়গা নেই।'

'আপনি মি. ফারফ্রেকে বিয়ে করেছেন?' খবরটা শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলো এলিজাবেথ-জেন। নিজের ঘরে জানালার পাশে বসে ছিল মেয়েটি। খানিকক্ষণ ধরে গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। কারণটা বুঝতে পারছিল না ও। এখন পারল। ফারফ্রের সঙ্গে লুসেটার বিয়ের খবর জানান দেয়া হচ্ছে।

এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয় এলিজাবেথ। লুসেটা কামরা ত্যাগ করলে সিদ্ধান্ত নিল, এখুনি চলে যাবে সে।

বিকেলের গোড়ায় ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। একটা পছন্দসই ঘর ভাড়া পেতেও বিশেষ দেরি হলো না। সিদ্ধান্ত নিল সে রাতেই ওখানে উঠে যাবে ও। নিঃসাড়ে হাই-প্লেস হলে ফিরে এসে চট জলদি লুসেটার উদ্দেশে একখানা চিরকুট লিখে ফেলল। এবার পরিধেয় ছেড়ে সাদামাঠা পোশাক গায়ে চড়াল। নিজের সামান্য যা কিছু সম্বল তাই বেঁধেছেঁদে বাড়ি ত্যাগ করল। লুসেটা তখন সিটিং-রূমে ডোনাল্ডের সঙ্গে বসে, তার কোন ধারণাই নেই এলিজাবেথ চলে গেছে।

ইতোমধ্যে ক্যাস্টারব্রিজে চাউর হয়ে গেছে বিয়ের খবরটা। লোকের এখন একটাই প্রশ্ন, ফারফ্রে কি তার স্বাধীন ব্যবসা চালিয়ে যাবে, নাকি ব্যবসা বেচে দিয়ে ভদ্রলোকের মত বউয়ের পয়সায় বসে বসে খাবে?

আট

হেঞ্চার্ড এখন দেউলিয়া কেন, তার খুঁটিনাটি বর্ণনা না করলেও চলে। তার ঘটনা আর সবার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। একদিন কিংস আর্মসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরা লক্ষ করল এলিজাবেথ। লোকমুখে জানতে পারল, আদালতের কর্মকর্তাদের সভা হবে। ওখানে স্থির হবে হেঞ্চার্ডের ভাগ্য।

এক পর্যায়ে হেঞ্চার্ডকে পকেট থেকে সোনার ঘড়ি ও টাকার থলে বের করতে দেখল এলিজাবেথ। ওগুলো টেবিলে রাখার পর হেঞ্চার্ড বলল, 'এ সব কিছু এখন আপনাদের।' বাঁধন খুলে সে থলেটা উপুড় করতে অল্প কটা টাকা ঝরে পড়ল টেবিলের ওপর। 'আরও বেশি থাকলে আপনাদের জন্যে ভাল হত,' বলল হেঞ্চার্ড।

পাওনাদারদের বেশিরভাগই কৃষক। তারা ঘড়িটা ও টাকাগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

'না, না, হেঞ্চার্ড,' একজন বলল আন্তরিক কণ্ঠে। 'ও আমরা চাই না। আপনার জিনিস আপনি রেখে দিন।...এ বিষয়ে আপনারা কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই,' অপর একজন বিড়বিড় করে আওড়াতে বাদ বাকিরা সায় জানাল।

'হ্যাঁ, তো, মি. হেঞ্চার্ড,' সিনিয়র কর্মকর্তা শুরু করল, 'কেস যদিও খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার মধ্যে আমরা কোন শঠতা দেখিনি। আপনার ব্যালান্স শীটে কোন ফাঁক নেই। আপনি কোন কিছুই আমাদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করেননি। হঠকারিতার কারণে যদিও আজকের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আমি যদ্দূর দেখতে পাচ্ছি কাউকে ঠকানোর কোন চেষ্টা আপনি করেননি।'

জানালার কাছে সরে গেল হেঞ্চার্ড। এ লোকের কথাগুলো কী পরিমাণ প্রভাব ফেলেছে তার ওপর কেউ যাতে তা দেখতে না পায়। সম্মতির গুঞ্জন উঠল এবং মুলতবী হয়ে গেল সভা। সবাই চলে গেলে ঘড়িটার দিকে চাইল হেঞ্চার্ড। ওর জন্যে রেখে যাওয়া হয়েছে ওটা। 'এটার ওপর আমার কোন দাবি নেই,' বলল আপন মনে। 'ওরা নিয়ে গেল না কেন? অন্যের জিনিসে দরকার নেই আমার!' উল্টোদিকে ঘড়ি নির্মাতার দোকান। সেখানে গিয়ে ঘড়িটি বেচে দিল সে। টাকাটা পৌঁছে দিল জনৈক পাওনাদারের কাছে। সে বেচারা ডার্নোভারের সামান্য এক কৃষিজীবী, তারই মত টাকার টানাটানিতে পড়েছে।

শহরে হেঞ্চার্ডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষেরও কিন্তু অভাব নেই। এমনকি অতীতে যারা নানা কারণে তার সমালোচনা করেছে তারাও এখন ওকে সহমর্মিতা জানাচ্ছে।

প্রায়োরি মিলের পাশে জপের কুটির। সেখানে গিয়ে উঠেছে হেঞ্চার্ড। সাবেক ম্যানেজারের কাছ থেকে দুটো কামরা ভাড়া নিয়েছে। এলিজাবেথ বাবার নতুন ভাড়াবাড়ির কথা শুনে রীতিমত বিস্মিত। ইদানীং পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ড্রেসমেকার হিসেবে কাজ করছে সে। বাবার অফিসের উল্টোদিকে তার ভাড়াবাসা। ওখানে একদিন রঙের কাজ চলছে, সবিস্ময়ে লক্ষ করল ও। অফিসের প্রবেশদ্বারে রঙ দিয়ে মুছে দেয়া হয়েছে হেঞ্চার্ডের নাম। ওপরে সাদা কালিতে চকচক করছে ফারফ্রের নাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও ঘটনা কি জানার জন্যে।

অ্যাবেল হুইটলের মুখে সব জানতে পারল। 'মি. ফারফ্রে এখন এখানকার মালিক। বলা উচিত না, কিন্তু আমাদের জন্যে এটা ভাল হলো। আমরা এখন অনেক বেশি খাটব, মনের মধ্যে ভয় থাকবে না। আগে তো গালি-গালাজ খেতে খেতে জান যেত। হপ্তায় যদিও মাত্র এক শিলিং করে পাব, তারপরও আমি খুশি, মিস হেঞ্চার্ড!'

অধঃপতনের কিছুদিন পর, মিলের কাছে সেতুটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল হেঞ্চার্ড, দৃষ্টি তার নিচে পানির গভীরে নিবদ্ধ। বিষাদময় জায়গাটা বিষণ্ন সব চিন্তার জন্ম দেয়। হেঞ্চার্ডের ভাবনায় ছেদ পড়ল জপের আগমনে।

'ওরা আজ নতুন বাসায় উঠছে,' বলতে বলতে হেঞ্চার্ডের পাশে এসে দাঁড়াল জপ।

'ও, তাই নাকি?' হেঞ্চার্ড অন্যমনস্ক। 'কোন্ বাসায়?'

'আপনি যেটায় ছিলেন।'

'আমার বাসায় উঠছে? শহরে এত বাড়ি থাকতে–'

'কাউকে না কাউকে তো ওখানে বাস করতেই হবে। আর আপনার তো তাতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

কথাটা তেতো হলেও সত্যি। কি ক্ষতি হেঞ্চার্ডের? ফারফ্রে ব্যবসাটাই যখন দখল করে নিয়েছে তখন আর বাড়িটাই বা বাদ থাকবে কেন? ওখানে বাস করলে তার কাজে-কর্মে অনেক সুবিধা হবে। মনটা তবু খচ্-খচ্ করছে হেঞ্চার্ডের। সে ভাড়াবাড়িতে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, আর ফারফ্রে কিনা তারই পুরানো বাড়িতে উঠছে?

ওদিকে জপ আবার কথার খেই ধরল। 'আপনার ভাল ভাল সব ফার্নিচারগুলো কে কিনেছে জানেন? ওই ফারফ্রে। নিলাম ডাকতে লোক পাঠিয়েছিল ও। জিনিসগুলো ওই বাড়িতেই থাকছে!'

'ফার্নিচারও কিনে নিয়েছে! কোন্‌দিন জানি আমার শরীর আর আত্মাটাকেও কিনে নেয়।'

'আপনি বেচতে চাইলে হয়তো কিনেও নেবে।' একদা অহঙ্কারী মনিবের অন্তরে জখম করে নিজের রাস্তা ধরল জপ। হেঞ্চার্ড চেয়ে চেয়ে নদীর খর স্রোত দেখতে লাগল।

এসময় আরেকজন ভ্রমণার্থীকে এদিকে আসতে দেখা গেল। এক্কা চালাচ্ছে। 'মি. হেঞ্চার্ড?' ফারফ্রের গলা।

ফারফ্রে নেমে এসে পুরানো বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল। 'শুনলাম আপনি নাকি দেশ ছাড়ছেন, মি. হেঞ্চার্ড?' বলল। 'কথাটা কি সত্যি? প্রশ্নটা করার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

হেঞ্চার্ড ক'মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি। কয়েক বছর আগে তুমি যেখানে যাচ্ছিলে আমি ঠেকিয়েছিলাম, এখন আমি নিজেই সেখানে যাব ঠিক করেছি। মনে পড়ে কিভাবে তোমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে থাকতে রাজি করিয়েছিলাম? তোমার তখন কিছুই ছিল না, আর আমার সব ছিল। এখন তোমার সব আছে, আর আমি পথের ফকির।'

'হ্যাঁ, নিয়তির খেলা কি করবেন!'

'হা-হা-হা-ঠিক বলেছ,' সহসা বুনো উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হেঞ্চার্ড। 'ওঠা আর নামা। আমি এতে অভ্যস্ত। কি এসে গেল!'

'আমার কথা একটু মন দিয়ে শুনবেন? অবশ্য আপনার হাতে যদি সময় থাকে,' বলল ফারফ্রে। 'আমি সেদিন যেমন আপনার কথা শুনেছিলাম। বিদেশে যাবেন না। দেশেই থাকুন।'

'আমাকে যেতেই হবে!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল হেঞ্চার্ড। 'সামান্য যা টাকা হাতে আছে তাতে আর বড়জোর কয়েকটা সপ্তাহ চলবে। দেখি না অন্য কোথাও গেলে ভাগ্য ফেরে কিনা।'

'আমি বলি কি, আপনার আগের বাসায় চলে আসুন। ঘরের তো ছড়াছড়ি ওখানে। যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন ওখানেই থাকলেন। আমার স্ত্রী কিছু

মনে করবে না।'

আঁতকে উঠল হেঞ্চার্ড। 'না, না,' গোঁয়ারের মত বলল, 'আমাদের ঝগড়া লেগে যাবে।'

'আপনি আলাদা জায়গায় নিজের মত করে থাকবেন,' বলল ফারফ্রে। 'কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে যাবে না। ওখানে থাকাটা অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর হবে, এখানে এই নদীর পারে থাকার চাইতে।'

হেঞ্চার্ড তবু গোঁ ধরে রইল। 'তুমি জানো না বলে এসব কথা বলছ,' বলল। 'তবে প্রস্তাবটার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'যাকগে, জানেন নিশ্চয়ই আমি আপনার বেশিরভাগ ফার্নিচার কিনে নিয়েছি?'

'জানি।'

'পছন্দ করে কিনেছি এমন কিন্তু নয়; আপনার যেগুলো যেগুলো প্রিয় সেগুলো নিজের বাসায় নিয়ে আসতে পারেন। আমরা অত ফার্নিচার দিয়ে কি করব? অল্প কয়েকটা হলেই চলবে।'

'কি–মাগনা দিয়ে দিতে চাও?' বলল হেঞ্চার্ড। 'কিন্তু তোমাকে তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে!'

'তা বটে, কিন্তু আমার কাছে যতটা আপনার কাছে ওগুলোর মূল্য তার চাইতে অনেক বেশি।'

ঈষৎ আলোড়িত হলো হেঞ্চার্ড। 'মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তোমার সাথে অন্যায় করেছি!' আবেগের সুর ওর কণ্ঠে। হঠাৎই ফারফ্রের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে, শশব্যস্তে জপের কটেজের উদ্দেশে হাঁটা দিল।

এর ক'দিন পরে এলিজাবেথ খবর পেল, হেঞ্চার্ড শয্যাশায়ী–তার ঠাণ্ডা লেগেছে। তখুনি বাবার বাসায় যাবে বলে বেরিয়ে পড়ল ও। গিয়ে দেখতে পেল, বাবা ইয়াবড় এক কোট মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে রয়েছে। প্রথমটায় তো হেঞ্চার্ড খেপেই উঠল ওকে দেখে। 'এখানে এসেছ কি করতে? যাও-যাও!'

'কিন্তু, বাবা–'

'আমি তোমাকে এখানে দেখতে চাই না।'

কিন্তু গেল না এলিজাবেথ। কামরাটাকে গোছগাছ করে বিদায় যখন নিল, সৎ বাবা তখন আপত্তি তুলে নিয়েছে।

এলিজাবেথের সেবা পেয়ে দ্রুত সেরে উঠল হেঞ্চার্ড। এখন আর সে বিদেশযাত্রার কথা ভাবে না, বরং ভাবে এলিজাবেথকে নিয়ে। আপাতত তার মূল সমস্যা বেকারত্ব, কাজ-কর্ম নেই বলে মন মরা হয়ে থাকে। সৎ উপায়ে অর্থোপার্জনে লজ্জার কিছু নেই, এ কথা উপলব্ধি করে একদিন ফারফ্রের ইয়ার্ডে গেল হেঞ্চার্ড। খড় কাটার কোন কাজ আছে কিনা জানতে চাইল। তাকে তখুনি কাজে লাগিয়ে দিল ফারফ্রে।

নীল রঙের পুরানো সুট, ময়লা সিল্কের হ্যাট, জীর্ণ সিল্কের কালো ওয়েস্টকোট পরা হেঞ্চার্ডকে ঠিক যেন মানায় না অন্যান্য কর্মচারীদের পাশে। আর সবার সঙ্গে সে-ও লক্ষ করছে, সবুজ দরজাটা দিয়ে ডোনাল্ড ফারফ্রে প্রকাণ্ড বাড়িটার ভেতরে-বাইরে ঘন ঘন যাতায়াত করছে।

শীত মৌসুমের প্রথমভাগে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, মি. ফারফ্রে, ইতোমধ্যেই যে শহর কাউন্সিলের সভ্য, শীঘ্রিই মেয়র হতে যাচ্ছে।

'এই. বয়সেই মেয়র!' কথাটা কানে যেতে আপনমনে বলল হেঞ্চার্ড। সে তখন ফারফ্রের খড়ের গুদামে যাচ্ছিল। চিন্তাটা জুড়ে বসল তার মগজে, ডোনাল্ড ফারফ্রের বিরুদ্ধে আবারও বিষিয়ে উঠল অন্তর।

'লুসেটার টাকায় আকাশে উড়ছে। হা-হা–কী অদ্ভুত কাণ্ড! ছিল আমার কর্মচারী, এখন উল্টো আমাকেই কর্মচারী বানিয়েছে। আমার বাড়ি-ঘর, ব্যবসা, ফার্নিচার এমনকি হবু স্ত্রীকে পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে!'

দিনের মধ্যে একশোবার এসব ভাবনা খেলা করে তার মনের ভেতর। ফারফ্রের প্রতি ঘৃণা বোধ ফিরে আসার পাশাপাশি নৈতিক পরিবর্তনও লক্ষ করা গেল লোকটির চরিত্রে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে ইদানীং প্রায়ই উচ্চারণ করে, 'আর তো মাত্র পনেরোটা দিন! আর বড়জোর বারো দিন!' এভাবে ক্রমেই সংখ্যা কমিয়ে আনছে সে।

'রোজ রোজ কিসের হিসেব করছেন আপনি?' পাশের কর্মচারীটি একদিন প্রশ্ন করল।

'আমার শপথ মুক্তির।'

'কিসের শপথ?'

'মদ না খাওয়ার। আর ক'দিন পর শপথ নেয়ার একুশ বছর পূর্ণ হবে। তারপর ইচ্ছেমত জীবনটাকে উপভোগ করব আমি।'

এক রবিবার। এলিজাবেথ-জেন জানালার ধারে বসে, এসময় শুনতে পেল নিচে রাস্তায় কেউ একজন হেঞ্চার্ডের নাম উচ্চারণ করল। ব্যাপারটা কি তা ভাবছে, এসময় এক পথযাত্রী তার মনের প্রশ্নটা করে বসল

'মাইকেল হেঞ্চার্ড একুশ বছর পর মদ খাওয়া ধরেছে

এলিজাবেথ কেঁপে উঠল। চটপট তৈরি হয়ে একটু পরে বেরিয়ে পড়ল

হেঞ্চার্ড সেদিন সকালে থ্রী মেরিনার্সকে বেছে নিয়েছে

এলিজাবেথ যখন ওখানে ঢুকল, হেঞ্চার্ড নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছে। মেয়েটি তাকে বাড়ি ফেরার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। এক পর্যায়ে লোকটির বাহু ধরে টান দিতে কেন কে জানে সে বাধা দিল না। বাধ্য ছেলের মত ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল। তারপর পথ চলতে লাগল অন্ধের মত ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে।

এ ঘটনার পর থেকে, ইয়ার্ডে সৎ বাবার জন্যে চা নিয়ে আসতে লাগল এলিজাবেথ। আর বাবার কাজ শেষ হলে পৌঁছে দিতে লাগল বাসায়, উদ্দেশ্য থ্রী মেরিনার্সে যেন যেতে না পারে। এমনি এক দিনের কথা। লুসেটা ইয়ার্ডে এসেছে স্বামীর খোঁজে। হেঞ্চার্ড যে ওখানে রয়েছে তার জানা ছিল না।

'ওহ!' হেঞ্চার্ডকে লক্ষ করে শ্বাস চাপল সে, আতঙ্কিত। আর সবার মত হেঞ্চার্ডও প্রভুপত্নীর উদ্দেশে সম্মান জানাল, হ্যাটের কানা স্পর্শ করে।

'গুড আফটারনুন,' অনুচ্চ স্বরে বলল লুসেটা।

'কিছু বললেন, ম্যাম?' হেঞ্চার্ড ভান করল যেন শুনতে পায়নি।

'আমি বলেছি গুড আফটারনুন,' তো-তো করে বলল মহিলা।

'ও হ্যাঁ, গুড আফটারনুন, ম্যাম,' ফের হ্যাট ছুঁয়ে বলল হেঞ্চার্ড। 'আপনাকে দেখে প্রীত হলাম, ম্যাম।'

লুসেটাকে বিচলিত দেখাল। হেঞ্চার্ড বলে চলল, 'আমরা সামান্য কর্মচারী তো, কোন ভদ্রমহিলা আমাদের সাথে কথা বললে কৃতার্থ হয়ে যাই।' চোখে মিনতি নিয়ে হেঞ্চার্ডের দিকে চাইল লুসেটা; লোকটির বিদ্রূপ বড় বেশি বিঁধছে তাকে।

'কটা বাজে বলতে পারেন, ম্যাম?'

'হ্যাঁ,' ঝটিতি জবাব দিল লুসেটা। 'সাড়ে চারটে।'

'ধন্যবাদ। আর দেড় ঘণ্টা পর ছুটি। আমরা ছোট জাতের মানুষরা, ম্যাম, আপনাদের মত আরামের জীবন কল্পনাও করতে পারি না।'

লুসেটা কালবিলম্ব না করে হেঞ্চার্ডকে ছেড়ে সরে পড়ল, এলিজাবেথ-জেনের সঙ্গে দেখা হলে তার উদ্দেশে মাথা নেড়ে মৃদু হাসল।

পরদিন ডাকপিয়ন একটা চিঠি পৌঁছে দিল হেঞ্চার্ডের হাতে।

'তুমি দয়া করে,' ছোট্ট চিঠিটার মধ্যে যতটা সম্ভব তিক্ততা ভরে দিয়েছে লুসেটা, *'ওভাবে আমার সাথে আর কথা বোলো না। তোমার প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করি না আমি। তুমি আমার স্বামীর হয়ে কাজ করো সেজন্যে আমি আনন্দিত। আশা করব, আমাকে তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য করবে; এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে মনে কষ্ট দেয়ার আর চেষ্টা করবে না। আমি কোন অন্যায় করিনি, এবং তোমার কোন ক্ষতিও করিনি।'*

'গাধা কোথাকার! চিঠি লেখার কি দরকারটা ছিল? ওর প্রাণপ্রিয় স্বামীকে যদি এটা দেখাই—ফুহ!' আগুনে ফেলে দিল ও কাগজটা।

ফারফ্রে স্ত্রীর সঙ্গে হেঞ্চার্ডের পুরানো সম্পর্কের কথা এখনও জানে না। সে বুঝে পায় না কেন তাকে এতটা ঘৃণা করে লোকটি।

'আমি ওর কি ক্ষতি করেছি?' স্ত্রীকে একদিন প্রশ্ন করে সে। 'ও নাকি গ্রী মেরিনার্সে বসে আমার উদ্দেশ্যে হুমকি-ধমকি দেয়। হ্যাঁ, খানিকটা ঈর্ষা হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে এই পরিমাণ ঘৃণা করবে কেন? তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারো, লুসেটা? ওর কাণ্ড-কারখানা দেখলে মনে হয় প্রেমিকাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে বুঝি আমার সাথে।'

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লুসেটার। 'কে জানে কেন এমন করে,' জবাবে বলল।

'আমি স্বেচ্ছায় ওকে চাকরি দিয়েছি—অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাও তো সত্যি, ও যে কোন সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'ডোনাল্ড, তুমি কি কিছু শুনেছ?' সতর্ক কণ্ঠে বলল লুসেটা। 'আমার সম্পর্কে—' শেষের এই কথাগুলো উহ্য রাখল। মনের উদ্বেগ চাপা দিতে পারছে না সে, চোখ অশ্রুসিক্ত।

'না-না, তুমি যা ভাবছ অতটা সিরিয়াস নয় ব্যাপারটা,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল ফারফ্রে। তার জানা নেই কতখানি গুরুতর বিষয়টা, কিন্তু লুসেটার আছে।

'আমরা যা ভাবছিলাম তাই করা উচিত,' বলল লুসেটা। 'ব্যবসা বন্ধ করে

এখান থেকে চলে যাব। আমাদের তো প্রচুর টাকা, এখানে পড়ে থাকার দরকারটা কি?'

এ নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলাপ চলল। আলোচনায় বাধা পড়ল এক অতিথির আকস্মিক আগমনে। ওদের পড়শী অল্ডারম্যান ভ্যাট।

'আপনাকে চুপি চুপি একটা প্রশ্ন করতে এসেছি,' ভূমিকা সেরে বলল সে। 'আপনাকে মেয়রের পদ সাধা হলে নেবেন?'

'এত হোমরা-চোমরা থাকতে আমাকে কেন? আমার বয়স কম, লোকে বলবে আমি অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল ফারফ্রে।

'মোটেই না। আমি নিজের থেকে আসিনি, কয়েকজন কাউন্সিলর আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। আপনি রাজি হয়ে যান, প্লীজ।'

'আমরা শহর ছাড়ার কথা ভাবছিলাম,' চট করে বলে সংশয়ের দৃষ্টিতে ফারফ্রের উদ্দেশে চাইল লুসেটা।

'ওই ভাবনা পর্যন্তই,' বিড়বিড় করে বলল ফারফ্রে। 'বেশিরভাগ কাউন্সিলর যদি চান তবে আমার আপত্তি নেই।'

'চমৎকার। ভেবে নিন আপনি মেয়র হয়ে গেছেন। বয়স্ক লোকেরা তো অনেকবারই হলো,' বলল ভ্যাট।

সে চলে গেলে ফারফ্রে চিন্তিত মুখে বলল, 'বিধাতা আমাদেরকে নিয়ে কিভাবে খেলা করেন দেখো। আমরা ভাবি এক, হয় আরেক। ওরা মেয়র করতে চাইলে আমাকে থাকতে হবে, আর হেঞ্চার্ড এতে আরও খেপে উঠবে।'

সেদিন সন্ধের পর থেকে মনের শান্তি হারাম হয়ে গেল লুসেটার। ও ঠিক করল, হেঞ্চার্ডের কাছে আবারও ফেরত চাইবে ওর লেখা চিঠিগুলো। এজন্যে একটু বুদ্ধি খাটাতে হলো ওকে। একদিন বাজার এলাকায় সহসা মুখোমুখি পড়ে গেল হেঞ্চার্ডের, ভাবখানা এমন যেন ব্যাপারটা কাকতালীয়।

'আমি তো দেব বলে প্যাকেট করেই রেখেছিলাম–কিন্তু তুমিই তো এলে না। কোচে করে আসার কথা ছিল না?'

খালা মারা যাওয়াতে আসা হয়নি লুসেটার, সে কথা জানাল। 'তা সেই প্যাকেটটার কি হলো?' উদ্‌গ্রীব হয়ে জবাব চাইল।

জানা নেই হেঞ্চার্ডের। লুসেটা চলে গেলে তার মনে পড়ল, একগাদা বাতিল কাগজ সে রেখে দিয়েছিল পুরানো বাড়ির ডাইনিংরুমের দেয়াল সংলগ্ন আলমারিতে–এখন যা ফারফ্রের দখলে। চিঠিগুলো সম্ভবত ওখানেই রয়েছে।

পরদিন সকালে যথারীতি কাজে গেল ও। তবে ফারফ্রের প্রতি ঘৃণার আগুন আজ দাউদাউ করে জ্বলছে তার বুকে। কেননা, গতকালই সে জেনেছে ফারফ্রেকে মেয়র নির্বাচিত করা হয়েছে।

এগারোটা নাগাদ ইয়ার্ডে প্রবেশ করল ফারফ্রে। তাকে ডাইনিংরুমের আলমারিতে রাখা কাগজের প্যাকেটটার কথা বলল হেঞ্চার্ড।

'ওটা তাহলে ওখানেই আছে,' পতিত শত্রুর প্রতি আজ বাড়তি বন্ধুভাব দেখাল ও। 'আলমারিটা কখনোই খুলিনি আমি।'

'ওটা দামী কিছু নয়–আমার কাছে,' জানাল হেঞ্চার্ড। 'তবু আপনার অসুবিধে

না হলে আজকে সন্ধেয় ওটা নিতে আসতাম।'

বেশ দেরি করে ও বাড়িতে গেল সে। যাওয়ার আগে কয়েক গেলাস তরল গলায় ঢেলে গেল। ফারফ্রে সোজা নিয়ে গেল ওকে ডাইনিংরুমে, তারপর আলমারি খুলে কাগজের প্যাকেটটা ধরিয়ে দিল হাতে। ক্ষমা প্রার্থনা করল আগে ফেরত দেয়নি বলে।

'তাতে কি,' শুকনো কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড। 'বেশিরভাগই তো চিঠি-পত্র···হ্যাঁ,' বলে বসে পড়ল ও, একটুক্ষণের মধ্যেই লুসেটার আবেগঘন একতাড়া চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলল। 'এই যে। দেখি তো! মিসেস ফারফ্রে ভাল আছেন তো?'

'ক্লান্তি বোধ করছে, তাই সকাল সকাল শুতে চলে গেছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি,' বলে চলল হেঞ্চার্ড, 'আমার জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের কথা আপনাকে বলেছিলাম? এ চিঠিগুলো সেই দুঃখজনক ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মনে পড়ে তখন আপনি কিভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন?'

'সেই বেচারীর কি খবর?'

'কপালগুণে বিয়ে হয়েছে তার, এবং ভাল বিয়ে,' বলল হেঞ্চার্ড, 'তাই আর এসব অভিযোগের চিঠি পড়ে অপরাধবোধে ভুগি না···একটু মন দিয়ে শুনুন, মেয়েরা খেপে গেলে কি সব লেখে!' ফারফ্রে মোটেও উৎসাহ পাচ্ছে না, কিন্তু তারপরও হাই তুলে শুনে যেতে লাগল।

'সত্যি কথা বলতে আমার সামনে,' পড়ছে হেঞ্চার্ড, *'কোন ভবিষ্যৎ নেই। আমার পক্ষে অন্য কারও স্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। যদিও তুমি আমার প্রতি অন্যায় করোনি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আমার জীবন এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার কেউ আমার সাথে কথা বলে না। আমি ভয়ানক একা!'*

'এভাবে আমাকে খোঁচাখুঁচি করত ও,' বলছে হেঞ্চার্ড। 'অথচ আমার হাত-পা ছিল বাঁধা, কিছুই করার উপায় ছিল না।'

'হ্যাঁ, মেয়েদের স্বভাবটাই এমন।' অন্যমনস্ক শোনাল ফারফ্রের গলার স্বর।

আরেকটি চিঠির ভাঁজ খুলে পুরোটা পড়ে শোনাল হেঞ্চার্ড, তবে নামটা এড়িয়ে গেল আবারও। 'নাম বলছি না,' সাধু সাজল। 'এখন সে অন্যের ঘরণী, নাম বলে দেয়াটা অভদ্রতা, তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল ফারফ্রে। 'কিন্তু আপনার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাকে বিয়ে করলেন না কেন?' ফারফ্রে এমন কণ্ঠে প্রশ্নটা করল, ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলে লোকে যেমনটা করে।

'আহ–ভাল প্রশ্ন করেছেন!' শয়তানী হাসি হেসে বলল হেঞ্চার্ড। 'এতসব কিছু লেখার পর,' চিঠিগুলো দোলাল। 'যখন বিয়ের প্রস্তাব দিই তখন সে বেঁকে বসে। বিয়ে করে অন্য আরেকজনকে!'

'মহিলা খুব চঞ্চলমতি মনে হচ্ছে!' হেসে বলল ফারফ্রে।

'ঠিক ধরেছেন,' জোর দিয়ে বলল হেঞ্চার্ড। অবশ্য ফারফ্রে কিছু আঁচ করতে পারল না।

আরও ক'খানা চিঠি পাঠ করল হেঞ্চার্ড, চিঠির শেষে নামটা উচ্চারণ করতে করতেও বারবার থমকে গেল। অতটা নিচে নামতে বাধল তার।

ওদিকে, ক্লান্ত শরীরে বিছানায় গেলেও ঘুম নেই লুসেটার চোখে। গরম দুধ খেলে কাজ হতে পারে ভেবে পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল ও। ডাইনিংরুমের পাশ কাটাচ্ছে, ভেতরে কথা-বার্তার শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে আতঙ্কে হাত-পা হিম হয়ে এল। হেঞ্চার্ডের মুখ দিয়ে স্বয়ং ওর কথাগুলো অনর্গল বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে প্রেতাত্মারা বুঝি উঠে আসছে কবর থেকে।

লুসেটা ব্যানিস্টার আঁকড়ে ধরে অসহায়ের মত পিঠ ঠেকাল দেয়ালে। কানে আরও কথা আসছে তার। কিন্তু তাকে সবচাইতে অবাক করল স্বামীর গলার সুর। এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না, ভদ্রতা করে শুনতে হয় শুনে যাচ্ছে।

'একটা কথা,' বলল ফারফ্রে, হেঞ্চার্ডের আরেকটি চিঠির ভাঁজ খোলার শব্দ শুনে। 'এ চিঠিগুলো শুধু আপনার জন্যেই লেখা, অন্যকে পড়ে শোনানোটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'কেন হবে না? আমি কি তার নাম বলছি নাকি?'

'আমি হলে ওগুলো নষ্ট করে ফেলতাম,' বলল ফারফ্রে। 'মহিলা যেহেতু অন্যের স্ত্রী, এগুলোর কথা জানাজানি হয়ে গেলে তার বিপদ হতে পারে।'

'না, নষ্ট করব না আমি,' বলে চিঠিগুলো সরিয়ে ফেলল হেঞ্চার্ড। আর কোন কাগজের খস-খস শুনতে পেল না লুসেটা।

নির্জীবের মত বেডরুমে ফিরে গেল সে। হেঞ্চার্ড কি ওর স্বামীকে সব বলে দেবে? নিচতলায় দরজা লাগানোর শব্দ উঠল, তারপর ডোনাল্ড উঠে এল ওপরে। সে বেডরুমে ঢুকলে লুসেটা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। স্বামীর মুখের চেহারায় স্বস্তির হাসি, যেন বিরক্তিকর কোন কাজের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে—লক্ষ করে এক ধরনের বিস্ময় মেশানো আনন্দ হলো লুসেটার।

'উহ, কার পাল্লাতেই না পড়েছিলাম। এমন অতিথি না আসাই ভাল,' স্ত্রীকে বলল সে। 'আমার সন্দেহ হয় লোকটার মাথায় ছিট আছে। ওর অতীত জীবনের একগাদা চিঠি এতক্ষণ ধরে পড়ে শোনাল। আর আমাকেও মুখে হাসি ধরে রেখে শুনে যেতে হলো।'

পরদিন সকালে লুসেটা ঠিক করল, হেঞ্চার্ডকে চিঠি লিখবে। যা লিখল সেটি এরকম:

'কাল রাতে আড়াল থেকে শুনতে পেলাম তুমি আমার স্বামীর সাথে কথা বলছ। মনে হচ্ছে এভাবে তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও। কথাটা ভাবতেই আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে! একটু করুণা কি আমি তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না! কাল রাতে আমার কী অবস্থা হয়েছিল নিজের চোখে দেখলে একাজ করতে পারতে না। তোমার ছুটির সময় রোমান ধ্বংসস্তূপের কাছে থাকব আমি। দয়া করে ওদিকের রাস্তাটা দিয়ে এসো। তোমার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত, আর তুমি যতক্ষণ না কথা দিচ্ছ এমন কাজ আর করবে না, শান্তি পাব না আমি।'

লুসেটা যখন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল, সূর্য তখন অস্তগামী। বুকে ভয়মিশ্রিত আশা নিয়ে হেঞ্চার্ডের পথ চেয়ে রইল সে। একটু পরেই পাহাড়ের চুড়োয় উদয় হলো লোকটি, নেমে আসতে লাগল এদিকে। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে লুসেটার। ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি হতে লুসেটা আশ্চর্য এক পরিবর্তন লক্ষ করল লোকটির মধ্যে। ওর সঙ্গে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে থেমে দাঁড়াল হেঞ্চার্ড।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, অন্য কারও চোখে পরিবর্তনটুকু ধরা পড়ত না। অতিকায় ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়ানো লুসেটা। তার দেহ-কাঠামো প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল লোকটির স্মৃতির মণিকোঠার দরজায়। অবিচারের শিকার আরেক মহিলা একদা এসে দাঁড়িয়েছিল ওখানটায়, এখন সে আর বেঁচে নেই—ভাবনাটা মাথায় আসতে অনুশোচনায় ছেয়ে গেল হেঞ্চার্ডের অন্তর। লুসেটা কোন কথা বলার আগেই লোকটি মনস্থির করে নিল, তাকে যা বলা হবে শুনবে। এখন আর কোনমতেই বদলা নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

'কেমন আছ,' শান্ত-সহৃদয় কণ্ঠে শুধাল সে। 'এত অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?'

'তুমি জানো না কেন?' পাল্টা বলল লুসেটা। 'এজন্যে তো তুমিই দায়ী।'

'কি?' অসন্তোষের সুরে বলল হেঞ্চার্ড।

'তোমার হুমকি না থাকলে ভালই থাকতাম আমি। ও, মাইকেল, এভাবে আমাকে কষ্ট দিয়ো না! অনেক তো হলো, আর কত? এখানে যখন আসি তখন ছিলাম যুবতী, আর এখন কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছি। স্বামী বলো আর অন্য কোন পুরুষমানুষ বলো, কেউ আর বেশিদিন আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাবে না।'

লজ্জা বোধ করল হেঞ্চার্ড, লুসেটাকে অপমান করার ইচ্ছেটা মুহূর্তে মরে গেল।

'আমাকে কি করতে হবে বলো,' নরম সুরে বলল। 'আমি খুশি মনে করব। ওই চিঠিগুলো পড়েছি শুধু একটু নিষ্ঠুর রসিকতা করার জন্যে। আমি কিন্তু কিছুই ফাঁস করিনি।'

'চিঠিগুলো ফেরত দাও। সঙ্গে আমার আর কোন কাগজপত্র থাকলে তাও।'

'যত জলদি পারি দিয়ে দেব। একটা টুকরোও রাখব না···কিন্তু লুসেটা, আজ হোক কাল হোক, আমাদের সম্পর্ক ছিল এ কথা তোমার স্বামী কিন্তু ঠিকই জেনে যাবে।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস মোচন করল লুসেটা। 'কিন্তু ততদিনে আমার প্রতি ওর বিশ্বাস জন্মে যাবে। তখন হয়তো সব ক্ষমা করে দেবে!'

হেঞ্চার্ড নীরবে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার চিঠি পেয়ে যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি মুখ বন্ধ রাখব।'

নয়

হেঞ্চার্ডের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছে, লুসেটা লক্ষ করল এক লোক দরজার পাশে আধো আলোয় দাঁড়িয়ে। ও ভেতরে ঢুকতে যাবে, এসময় লোকটি এগিয়ে এসে কথা বলল। এ হচ্ছে জপ।

ক্ষমা চেয়ে নিল সে এভাবে পথ আগলানোর জন্যে। সে শুনেছে আশপাশের কোনও এক শস্য ব্যবসায়ী নাকি দক্ষ লোকের খোঁজ করছে। ফারফ্রের কাছে তেমন লোক আছে কিনা জানতে চেয়েছে। জপ কাজটা চায়। ফারফ্রেকে সে চিঠিও দিয়েছে অনুরোধ করে, কিন্তু লুসেটা যদি স্বামীকে একটু বলে দেয় তবে তার চাকরিটা হয়ে যায়।

'এ ব্যাপারে আমি কিছুই বুঝি না,' শীতল সুরে বলল লুসেটা।

'কিন্তু, ম্যাম, আমি যে বিশ্বস্ত লোক তা তো নিশ্চয়ই জানেন,' জপ নাছোড়। 'জার্সিতে আমি বেশ কয়েক বছর ছিলাম, আপনাকে ওখানে দেখেছি।'

'তাই নাকি?' বলল লুসেটা, অর্থটা ধরতে পারেনি। 'কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।'

'ম্যাম, আপনার মুখের দু'একটা কথায় আমার চাকরিটা হয়ে যায়–ওটা যে আমার ভীষণ দরকার, ম্যাম,' পীড়াপীড়ি করছে জপ।

লুসেটা স্রেফ প্রত্যাখ্যান করল। স্বামী ফেরার আগে বাড়িতে ঢুকতে হবে, এ চিন্তাটাই এখন কেবল মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তার। বিক্ষুব্ধ জপকে ফুটপাথের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে তড়িঘড়ি পা চালাল ও।

ইতোমধ্যে, হেঞ্চার্ড সিধে জপের কটেজে চলে গেছে। বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে লুসেটার পাঠানো যাবতীয় জিনিসপত্র জড় করল। জপের ফেরার শব্দ পেয়ে, নিচে নেমে এল তাকে অভিবাদন জানাতে।

'জপ,' বলল হেঞ্চার্ড, 'আমার একটা কাজ করে দেবে?' জপের প্রশ্নের জবাবে জানাল, 'এই প্যাকেটটা শুধু মিসেস ফারফ্রের কাছে পৌঁছে দেবে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু চাইছি না ওখানে আমাকে কেউ দেখে ফেলুক।'

জপ প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু অত তাড়াহুড়ো করার ঠেকা কিসের? এই ভেবে সে চলতি পথে এক পানশালায় ঢুকে পড়ল।

মদ পেটে যেতে তার অন্তরে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। হেঞ্চার্ডের দেয়া প্যাকেটটার উদ্দেশে সে শয়তানি ভরা হাসি নিয়ে চেয়ে রইল। 'কি গোমর আছে এর ভেতরে?' নিজেকে প্রশ্ন করল। খুব সহজেই তো খুলে দেখা যায়। 'মহিলার খুব দেমাগ,' বিড়বিড় করে আওড়ে সামনে ছড়ানো জিনিসগুলো লোভীর মত দেখতে লাগল। 'ওর গায়ে কালি লেপতে পারলে দারুণ হত! আরে, এ যে দেখছি প্রেমপত্র যে রে!'

মহা উত্তেজনায় জোর গলায় পড়তে লাগল সে, যার ইচ্ছে শুনতে পারে তার

উদাত্ত চিঠি পাঠ। এভাবে ক্যাস্টারব্রিজ শহরে, লুসেটা ফারফ্রের সম্মান ধূলিসাৎ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লেগে গেল সে।

পরদিন ভোরে, জপ পার্সেলটার মুখ এঁটে লুসেটার বাসায় দিয়ে এল। এক ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কাগজগুলো। বেচারী লুসেটার মন কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যাক, হেঞ্চার্ডের সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক ছিল, শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করা গেল।

শহরের বিত্তশালী লোকেদের মধ্যে এখন সাজ সাজ রব। রাজপুত্র এখান দিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছেন, শহরে আধ ঘণ্টাখানেকের জন্যে যাত্রাবিরতি করতে রাজি হয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার কাউন্সিলের বৈঠক বসল, দিনটি কিভাবে উদ্‌যাপন করবে সে বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করার জন্যে। কাউন্সিলররা সভা করছে, এসময় কাউন্সিল চেম্বারের দরজা খুলে গেল। কামরায় পা রাখল সাবেক মেয়র হেঞ্চার্ড। পরনে তার মলিন, জীর্ণ পোশাক। এখানে যখন সে অন্যদের সঙ্গে সভায় বসত তখন এ পোশাকটি তার গায়ে শোভা পেত।

'আচ্ছা,' এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর একটা হাত রাখল হেঞ্চার্ড। 'জানতে পারি মহান অতিথির সম্বর্ধনা কমিটিতে আমাকে নেয়া হচ্ছে না কেন? আমিও তো আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি, না কি?'

উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত। ফারফ্রে মেয়র হিসেবে সবার পক্ষ থেকে মতামত জানাল, 'তা হয় না, মি. হেঞ্চার্ড। কাউন্সিল কাউন্সিলই। আর আপনি যেহেতু এর সদস্য নন, ব্যাপারটা ঠিক হবে না। আপনাকে নিলে অন্যরা কি দোষ করল?'

'অ, তারমানে আমাকে কমিটির হয়ে অংশ নিতে দেয়া হবে না?'

'হ্যাঁ, তাই। অবশ্য দর্শক হিসেবে আর সবার মত আপনারও দেখার অধিকার থাকবে।'

হেঞ্চার্ড এ কথার কোন জবাব দিল না, বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। 'মহামান্য অতিথিকে কেউ যদি অভ্যর্থনা জানায় তো জানাব আমি, নইলে কেউ না!' যাওয়ার আগে বলে গেল।

রাজপুত্র এলেন রোদস্নাত এক সকালে। হেঞ্চার্ড সাত সকালে এক গেলাস রাম গলায় ঢেলে রাস্তায় বেরিয়েছে, দেখা হয়ে গেল এলিজাবেথ-জেনের সঙ্গে। প্রায় এক সপ্তাহ পর। 'কপাল ভাল,' মেয়েটিকে বলল সে, 'আজকের দিনটার আগেই আমার শপথের একুশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, তা নাহলে পরিকল্পনাটা আমার মাঠে মারা যেত।'

'কিসের পরিকল্পনার কথা বলছ?' মেয়েটি আতঙ্কিত।

'রাজপুত্রকে স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা।'

এলিজাবেথ দ্বিধায় পড়ে গেল। 'আমরা একসঙ্গে দেখতে যাব, কেমন?' বলল।

'দেখতে যাব মানে? তুমি দেখতে পারো! দেখার মত ব্যাপারই হবে বটে!' হাঁটা দিল সে, কোন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তার টের পাওয়া গেল।

এলিজাবেথ অন্তরাল থেকে অনুষ্ঠানের দৃশ্যপট নিরীখ করছে। ভদ্রমহিলাদের বসার জন্যে কিছু আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লুসেটা মেয়রের স্ত্রী হিসেবে সামনের সারিতে বসেছে। অপূর্ব সাজে সেজেছে সে। হেঞ্চার্ডকে দেখা গেল মহিলাদের আসনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, পরনে তার সেই কোন এককালের ভদ্রস্থ পোশাক–এখন যার দফারফা হয়ে গেছে। লুসেটা ইতিউতি চাইছে, হেঞ্চার্ডকে কিছুতেই যেন লক্ষ করতে রাজি নয়।

অবশেষে রাজপুত্র ও তাঁর অনুসারীদের বহন-করা ক্যারিজগুলোকে আসতে দেখা গেল। ক্যাস্টারব্রিজের বড় রাস্তা ধরে টাউন হলের উদ্দেশে এগিয়ে গেল যানগুলো। সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই স্থানটি। রাজকীয় ক্যারিজের সামনে অল্প কয়েক গজ ফাঁকা জায়গা, কেউ ঠেকানোর আগেই জায়গাটুকু ভরাট করে দিল এক লোক। হেঞ্চার্ড। তার গুটিয়ে রাখা ব্যক্তিগত পতাকাটা মেলে ধরে, মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিল। এবার টলমল পায়ে রাজপুত্রের ক্যারিজের পাশে এসে, বাঁ হাতে এলোপাতাড়ি নাড়তে লাগল ইউনিয়ন জ্যাক। আর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল অতিথির উদ্দেশে।

মহিলারা সব সমস্বরে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল আতঙ্কমাখা সুরে, 'দেখো, দেখো!' লুসেটা তো প্রায় মূর্ছা যায় আরকি। ভয়ার্ত চোখে গোটা দৃশ্য লক্ষ করল এলিজাবেথ।

ফারফ্রে মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দিল। হেঞ্চার্ডের কাঁধ চেপে ধরে তাকে হিড়হিড় করে পেছনদিকে টেনে নিয়ে এল, এবং কর্কশ কণ্ঠে ওখান থেকে দূর হয়ে যেতে বলল। হেঞ্চার্ডের সঙ্গে চোখাচোখি হতে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বলতে দেখল ধক ধক করে। ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়াল হেঞ্চার্ড, তারপর এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে সরে চলে গেল।

'ওই লোকটার ওখানে আপনার স্বামী কাজ করত না?' লুসেটার পাশে বসা মহিলাটি জিজ্ঞেস করল। এলাকায় নতুন এসেছে সে।

'ওর ওখানে!' খেদের সঙ্গে বলল লুসেটা। 'ও-ই আমার স্বামীর ওখানে কাজ করে।'

'তবে যে শুনি ক্যাস্টারব্রিজে আপনার স্বামীকে ও-ই প্রথম চাকরি দেয়? লোকে যে কত কথাই বলে!'

'মানুষের মুখ! ব্যাপারটা আসলে মোটেই সেরকম নয়। ডোনাল্ড উপযুক্ত লোক, সে যে কোনখানেই উন্নতি করত–কারও সাহায্যের প্রয়োজন পড়ত না!'

পুরানো কথা লুসেটার পুরোপুরি জানা নেই, তাই সে ওভাবে বলতে পারল। তাছাড়া কেন জানি তার মনে হচ্ছে, আজকের এই স্মরণীয় দিনে সবাই তাকে উপেক্ষা করছে। গোটা ঘটনাটা মিটে গেল ক'মুহূর্তের মধ্যে এবং রাজকীয় অতিথি এমন ভান করলেন, কোন বিসদৃশ দৃশ্য যেন তিনি লক্ষই করেননি। তিনি ক্যারিজ থেকে নেমে এলে মেয়র তাঁর উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ পাঠ করল। রাজপুত্র তার সঙ্গে করমর্দন করলেন, তারপর মেয়রের স্ত্রী লুসেটার হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন। ক'মিনিট মাত্র, এরপর ক্যারিজগুলো ভারী, ঘর্ঘর শব্দে আবার যাত্রা শুরু করল।

জনতার মাঝে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে অলস কর্মচারী ও মহিলাদের

সংখ্যাই বেশি। 'ও যখন প্রথম আসে তখন কি ছিল আর এখন কি, ভেবে দেখেছ?' ফারফ্রের উদ্দেশে ঈর্ষামিশ্রিত বাঁকা হাসি হেসে বলল একজন।

'আমি চাই ওর ওই দেমাগী বিবিটার মুখে চুনকালি পড়ুক ···দাঁড়াও না, শিগ্‌গিরিই সে ব্যবস্থা করছি,' বলল অপরজন।

চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবারই জানা আছে, বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছে। জপ লুসেটার গোপন চিঠিগুলো পাঠ করার ফলে ভয়ানক আলোড়ন পড়ে গেছে নিস্তরঙ্গ ক্যাস্টারব্রিজ শহরে। নিন্দা রটে গেছে লুসেটার নামে।

'হ্যাঁ, আজ রাতে। আমাদের শোভাযাত্রা আজ রাতেই হবে,' জপ সরাইখানায় বসে তার বন্ধুদের উদ্দেশে বলল। 'রাজ অতিথির শহর পরিদর্শনের পর ব্যাপারটা আরও জমবে, কেননা আজকে তো আকাশে উড়ছে ওরা।' জপের প্রতিশোধ নেয়াটা এখন যেন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

রাজকীয় অতিথি যদিও খুবই অল্প সময়ের জন্যে এসেছিলেন, তারপরও লুসেটার জন্যে সেটি এক মস্ত বড় বিজয়। রাজপুত্রের সঙ্গে করমর্দন করেছে সে, কম কথা নাকি?

ওদিকে, অনুষ্ঠানস্থল থেকে বিতাড়িত হেঞ্চার্ড ভাঙা মন নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত সে ফারফ্রের ওপর। 'যা ব্যবহারটা করল আমার সাথে, সেজন্যে পস্তাতে হবে ওকে,' আপন মনে আওড়াচ্ছে। 'দাঁড়াও না, লড়াই হবে–মুখোমুখি। তারপর দেখা যাবে কে পারে!' লুসেটার ওপরও বড্ড অভিমান তার। একটা সময় মহিলা কী ভীষণভাবেই না চাইত ওকে, আর আজ জনসমক্ষে ওর দিকে একবার চাইতে পর্যন্ত রাজি না!

ক্রুদ্ধ হেঞ্চার্ড আগে-পিছে না ভেবে ঝটপট ডিনার সেরে নিল। তারপর মাথা গরম অবস্থায় বেরিয়ে পড়ল ফারফ্রেকে খুঁজে বের করতে। আজ ভয়ানক কিছু একটা ঘটাবে সে।

রাস্তায় লোক-জন নেই। হেঞ্চার্ড কর্ন স্ট্রীটে ফারফ্রের বাসায় গিয়ে হাজির হলো। দরজায় টোকা দিয়ে একটা খবর দিয়ে এল। মালিকের সঙ্গে যথাশীঘ্র ইয়ার্ডে দেখা করতে চায় সে। কর্মচারীরা ইয়ার্ডে গরহাজির; আজ রাজ অতিথির আগমনের ফলে ছুটি ভোগ করছে। জনবিরল জায়গাটির চারধারে নজর বুলিয়ে নিল হেঞ্চার্ড।

এক ছাউনিতে প্রবেশ করল সে। এক টুকরো রশি খুঁজে নিয়ে বাঁ বাহু কষে বেঁধে নিল দেহের সঙ্গে। এবার মই বেয়ে উঠে এল শস্য-গুদামের সবচেয়ে ওপরতলায়।

ওখান থেকে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, ঘোঁৎ করে সন্তোষের শব্দ করল। এই চিলেকোঠা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রশস্ত জায়গা। বাড়ির মাঝামাঝি অবধি বিস্তার পেয়েছে মেঝেটা। কিনারা থেকে লক্ষ করতে দেখতে পেল নিচের মেঝেটার সঙ্গে ফারাক ত্রিশ-চল্লিশ ফুট।

কয়েক কদম পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল ও। এক সময় ফারফ্রেকে দেখা গেল ইয়ার্ডে। পরনের পোশাক দেখে মনে হলো বাইরে কোথাও যাবে বুঝি।

'এখানে একটু আসতে পারবে?' গলা ছেড়ে বলল হেঞ্চার্ড।

'আসছি,' বলল ফারফ্রে। 'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। কি ব্যাপার বলুন তো?' একটু পরে মই বেয়ে উঠে এসে হেঞ্চার্ডের পাশে দাঁড়াল।

'এখানে কি করছেন?' প্রশ্ন করল। কণ্ঠস্বর কঠোর তার, বুঝিয়ে দিল বিকেলের ঘটনাটা ভোলেনি। হেঞ্চার্ড মুহূর্তের জন্যে থমকাল। ফারফ্রে লক্ষ করল লোকটির একটা বাহু বাঁধা।

'দু'জন পুরুষ এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড। 'তোমার টাকা কিংবা সুন্দরী স্ত্রী তোমাকে আর আকাশে তুলছে না, আর আমার দারিদ্র্যও আমাকে পাতালে নামাচ্ছে না।'

'কি বলতে চান?' ফারফ্রে স্বাভাবিক স্বরে জবাব চাইল।

'ধৈর্য ধরো, বাছা। তুমি আজকের ও কাজটা ঠিক করোনি। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মেনে নিয়েছি আমি, কিন্তু সবার সামনে ওভাবে আমাকে অপমান করা–সহ্য করব না আমি।'

ফারফ্রেকে বিরক্ত দেখাল। 'ওখানে আপনার কোন কাজ ছিল না।'

'তোমাদের কারও চাইতে কমও ছিল না! কি করে বলতে পারলে এমন কথা?'

'আপনি রাজ অতিথির অসম্মান করেছেন, হেঞ্চার্ড; চীফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেয়র হিসেবে আপনাকে থামানো আমার দায়িত্ব ছিল।...আমি এখানে তর্ক করতে আসিনি। মাথা ঠাণ্ডা করুন, নিজেই বুঝতে পারবেন এছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

'ঠাণ্ডা খুব সম্ভব তোমাকেই আগে হতে হবে,' অশুভ কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড। 'আমরা এখন এখানে, এই চিলেকোঠার ওপরে–তুমি সকালবেলা যে লড়াইটা শুরু করেছ তার ফয়সালা করার জন্যে। মাটি এখান থেকে চল্লিশ ফুট নিচে। আমাদের মধ্যে যে কোন একজন অপরজনকে নিচে ফেলে দেবে–যে জিতবে সে থাকবে ওপরে। সে চাইলে নিচে নেমে গিয়ে লোক ডাকতে পারে, বলতে পারে অপরজন দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে গেছে–কিংবা সত্যি কথাটাও বলে দিতে পারে–সেটা তার ইচ্ছে। আমার গায়ে যেহেতু জোর বেশি, একটা হাত তাই বেঁধে নিয়েছি–যাতে বলতে না পারো কোন বাড়তি সুবিধা নিচ্ছি। কি, বোঝা গেছে? নাও, শুরু করো!'

লড়াই করা ছাড়া এমুহূর্তে আর কিছু করার নেই ফারফ্রের। কেননা হেঞ্চার্ড কথা শেষ করেই চেপে এসেছে ওর উদ্দেশে। জান বাঁচাতে লড়তে হচ্ছে ফারফ্রেকে, নিরুপায় সে। একটু পরে হাপরের মত হাঁপাতে লাগল ওরা দু'জনই। বেশ কিছুক্ষণ ধুন্ধুমার মারামারি চলল। যোদ্ধারা একবার সামনে যায়, একবার পিছে। কেউ সুবিধা করে উঠতে পারছে না। হেঞ্চার্ড নিয়েছে আক্রমণাত্মক ভূমিকা, ফারফ্রে রক্ষণাত্মক। অবশেষে এক পর্যায়ে, ফারফ্রেকে পেড়ে ফেলল হেঞ্চার্ড। কিনারা দিয়ে মাথা ঝুলে পড়ল যুবকের, একটা বাহুও নিচের দিকে দুলছে।

'সকালের ঘটনার,' শ্বাসের ফাঁকে বলল হেঞ্চার্ড, 'এখানেই সমাপ্তি। তোমার জীবন এখন আমার হাতে।'

'তাহলে দেরি করছেন কেন, নিয়ে নিন!' কোনমতে আওড়াল ফারফ্রে। 'আপনার কতদিনের শখ!'

নীরবে ওর দিকে চেয়ে রইল হেঞ্চার্ড, মিলিত হলো দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি।

'ওহ, ফারফ্রে! কথাটা ঠিক নয়!' তিক্ত স্বরে বলল। 'খোদা জানেন, একটা সময় তোমাকে যতটা ভালবেসেছিলাম, ততটা আর কোন লোক তার বন্ধুকে বাসেনি···আর এখন, তোমাকে খুন করতে এসেও পারছি না! আমাকে পুলিসে দাও–যা ইচ্ছে করো–আমার যা হয় হোক পরোয়া করি না!'

চিলেকোঠার অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণটিতে পিছু হটে গেল হেঞ্চার্ড, তারপর হাতের বাঁধন খুলে ঢলে পড়ল এক কোনায় রাখা ক'খানা বস্তার ওপর। ফারফ্রে নীরবে ওকে লক্ষ করে, মই বেয়ে নেমে গেল নিচে। হেঞ্চার্ড ওকে পিছু ডাকতে চেয়ে পারল না, মিলিয়ে গেল যুবকটির পদশব্দ।

লজ্জায় ডুবে গেল হেঞ্চার্ড। বসে বসে ফারফ্রের সঙ্গে পুরানো দিনের বন্ধুত্বের কথা ভাবছে। নিচে কথোপকথনের শব্দ শুনল, খুলে গেল আস্তাবলের দরজা, চালু হলো একটি ক্যারিজ।

আঁধার ঘনিয়ে আসতে উঠে পড়ল হেঞ্চার্ড। ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে, মই লক্ষ্য করে এগোল। ধীরেসুস্থে এবার নেমে এল ইয়ার্ডে।

'আমাকে বাকি জীবন ঘৃণা করে যাবে ও,' মনে মনে বলল।

যে করে হোক আজ রাতে তাকে ফারফ্রের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, ক্ষমা চাইতে হবে উন্মত্ত আচরণের জন্যে। কিন্তু ফারফ্রের বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ইয়ার্ডে একটুক্ষণ আগে ঘটে-যাওয়া ঘটনাটার কথা। ফারফ্রে ঘোড়া জুড়ে ক্যারিজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, তার আগে কার সাথে জানি কথা বলেছে। ও বলছিল, বাডমাউথে যাওয়ার কথা থাকলেও যাচ্ছে না। হঠাৎই ওয়েদারবারিতে ডাক পড়েছে তার, ওখান থেকে যাবে মেলস্টকে। কি নাকি কাজ আছে। মেলস্টক থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে, অন্য কখনও বাডমাউথে যাবে। তারমানে ফারফ্রেকে এখন পাওয়া যাবে না, তাকে পেতে হলে রাত করে আসতে হবে। অপেক্ষা করা ছাড়া এখন গতি নেই। কিন্তু ওর অস্থির মন যে মানছে না। শহরের রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল সে। দূরে আবছাভাবে গান-বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেঞ্চার্ড প্রথমটায় ভাবল, শহরের ব্যান্ড পার্টি বুঝি বা উৎসব করে রাজকীয় দিনটির ইতি টানতে চাইছে। কিন্তু পরক্ষণে উপলব্ধি করল, এ কোন ব্যান্ড পার্টির বাজনা নয়। উল্টোপাল্টা, কর্কশ ড্রাম পেটানোর শব্দ কোন ব্যান্ড পার্টির হতে পারে না।

আটটা বাজে প্রায়। সিটিং-রুমে একাকী বসে লুসেটা। একটি জানালা ঈষৎ ফাঁক করে রেখেছে, স্বামীর ক্যারিজের আওয়াজ যাতে আগেভাগে কানে আসে। চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছে, বিয়ের পর এতটা ফুরফুরে মেজাজে কোনদিন থাকেনি সে। চমৎকার কাটল আজকের দিনটা। হেঞ্চার্ড অবশ্য একটু গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওর স্বামীর ত্বরিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা বেশিদূর এগোতে পারেনি। হেঞ্চার্ডের ফেরত পাঠানো চিঠিগুলো ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সত্যিকার অর্থে ওর আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

বেশ খোশমেজাজে ছিল লুসেটা, হঠাৎই দূরাগত বাজনার শব্দে ওর চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। ক্রমেই বেড়ে চলেছে আওয়াজটা। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, শহরের বাসিন্দারা যে যার মত করে আজকের দিনটি উদ্‌যাপন করছে। কিন্তু শীঘ্রিই ওর মনোযোগ কেড়ে নিল রাস্তার ওপাশ থেকে ভেসে আসা এক কাজের মহিলার উচ্চকিত চিৎকার। আরেক বাড়ির কাজের লোকের উদ্দেশে গলা ছেড়েছে।

'অ্যাই, দেখতে পাচ্ছ? ওই যে!'

'কোথায়, কোথায়?'

'যাক, ওরা কর্ন স্ট্রীটে এল শেষ পর্যন্ত! দুটো মানুষ–হ্যাঁ–গাধা সেজেছে, পিঠাপিঠি, হাত একসঙ্গে বাঁধা! মেয়েটা সামনের দিকে মুখ করে, আর লোকটা পেছনের দিকে।

'কাউকে ভেঙাচ্ছে নাকি?'

'উম–মনে হয়। লোকটার গায়ে নীল রঙের কোট। কালো জুলফি, লাল মুখ। মুখোস এঁটেছে আরকি।'

'আর মেয়েলোকটা? তুমি বললেই বুঝতে পারব আমি যার কথা ভাবছি সে-ই কিনা।'

'বলছি। গির্জায় একদিন যে পোশাক পরে সে সামনের আসনে বসে ছিল, সেই পোশাক গায়ে চড়িয়েছে।'

লুসেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সে মুহূর্তে, ঘরের দরজাটা দ্রুত অথচ আলগোছে খুলে গেল। আগুন পোহাবার চুল্লী জ্বলছিল, তার আলোয় এসে দাঁড়াল এলিজাবেথ-জেন।

'আপনার সাথে দেখা করতে এলাম,' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। 'টোকা দিয়ে ঢুকিনি–ক্ষমা করবেন! জানালা খোলা যে? পর্দাও সরিয়ে রেখেছেন দেখছি!'

লুসেটার জবাবের তোয়াক্কা না করে ঝটিতি কাছের জানালাটার সামনে পৌঁছে গেল সে। টপ করে ওটা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল। লুসেটা এক ছুটে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'ওদের যা মন বলুক!' শুকনো কণ্ঠে বলে এলিজাবেথের হাত চেপে ধরল।

বাইরে উচ্চারিত কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে ঘরের ভেতর: 'ওটার ঘাড় খোলা, চুল উঁচু করে বাঁধা। ঝলমলে একটা সিল্কের কাপড় পরেছে, সাদা স্টকিং, পায়ে রঙচঙে জুতো।'

এলিজাবেথ এবার আরেকটি জানালা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল। কিন্তু হাত আঁকড়ে ধরে ওকে থামাল লুসেটা।

'আমার কথা বলছে!' মড়ার মত ফ্যাকাসে ওর মুখের চেহারা। 'সঙ সেজে মিছিল করছে–কলঙ্ক রটাচ্ছে–আমার আর ওর নামে!'

এলিজাবেথের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল সে ইতোমধ্যে ঘটনাটা জেনে গেছে।

'জানালাগুলো বন্ধ করে দিই,' সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল এলিজাবেথ। মিছিলটির ক্রমশ এগিয়ে আসার শব্দে আতঙ্কে জমে যাওয়ার দশা লুসেটার, লক্ষ

করেছে সে।

'বন্ধ করে দিই!'

'কোন লাভ নেই!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লুসেটার গলা দিয়ে। 'ডোনাল্ডের চোখকে তো ফাঁকি দেয়া যাবে না! ও শিগ্‌গিরিই বাড়ি ফিরবে–এসব দেখে ওর মন ভেঙে যাবে। ও আমাকে আর ভালবাসবে না। ওফ, আমি আর বাঁচব না–বাঁচব না!'

সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল এবার এলিজাবেথ। 'এসব বন্ধ করো–বন্ধ করো!' চিৎকার করে বলল। 'কেউ কি নেই যে বন্ধ করতে পারে?'

লুসেটার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গেল সে দরজা লক্ষ্য করে। লুসেটা ঝট করে জানালার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়িয়ে মরিয়ার মত স্বগতোক্তি করল, 'দেখব, আমি দেখব!'

এলিজাবেথ ওর উদ্দেশ্য লক্ষ করে, প্রায় ধেয়ে এসে থামাতে চেষ্টা করল। লুসেটার দৃষ্টি নিচের দৃশ্যটির ওপর স্থির। যে কেউ দেখলেই বুঝবে কাদের সাজে সেজেছে ওরা, সহজেই চিনতে পারবে। 'দেখবেন না, দেখবেন না,' মিনতি ঝরল এলিজাবেথের কণ্ঠে। 'আমাকে জানালাটা বন্ধ করতে দিন!'

বিদ্রূপের হাসি আর অশ্লীল হাঁক-ডাক যেন মরণবাণের মত আঘাত হানছে লুসেটার বুকে। ওর বেশ তো ধরেছেই, এমনকি অবিকল ওরটার মত একটি সবুজ ছাতা পর্যন্ত কোথা থেকে বাগিয়ে এনেছে। হঠাৎই বুনো হাসি হেসে উঠল লুসেটা। ক্ষণিকের জন্যে নিথর দাঁড়িয়ে থেকে পরমুহূর্তে সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে।

প্রায় একই সঙ্গে থেমে গেল শোভাযাত্রার উৎকট বাজনা। মিইয়ে এল জনতার অট্টরোল, পাতলা হয়ে আসছে ভিড়। ব্যাপারটা আধো উপলব্ধি করল এলিজাবেথ। ঘণ্টি বাজিয়ে, কার্পেটে পড়ে থাকা লুসেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। কাজের লোকেরা এল শেষ অবধি। লুসেটাকে বয়ে নেয়া হলো তার কামরায়, আর লোক পাঠানো হলো ডাক্তার নিয়ে আসতে।

অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় ডাক্তার চলে এল। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আর সবার মত সে-ও বোঝার চেষ্টা করছিল ব্যাপারখানা কি। লুসেটাকে পরখ করে, এলিজাবেথের উদ্বেগাকুল নীরব প্রশ্নটির জবাবে জানাল, 'রোগীর অবস্থা সিরিয়াস। অন্তঃসত্ত্বা জানেনই তো, আমি মা-শিশু দু'জনের জন্যেই ভয় পাচ্ছি। আপনি মি. ফারফ্রেকে ডাকান। কোথায় তিনি?'

'উনি তো বাডমাউথে গেছেন, স্যার,' বলল মেইড। 'শিগ্‌গিরই ফিরবেন।'

'ঠিক আছে। তবু লোক পাঠিয়ে দেয়াই ভাল, যদি দেরি করেন।' লুসেটার শিয়রে এসে বসল ডাক্তার। একটু পরেই ফারফ্রের জন্যে ইয়ার্ড থেকে লোক রওনা হলো।

কর্ন স্ট্রীটের ও মাথায় হেঞ্চার্ডও মিছিলটি লক্ষ করেছে। তার বুঝতে বাকি নেই কি এর অর্থ। সে তড়িঘড়ি সরে পড়ে এবং গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়, সৎ মেয়ের বাসায় যাবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে জানতে পারে সে গেছে ফারফ্রের বাসায়। স্বপ্নোত্থিতের মত ও বাড়ি লক্ষ্য করে হেঁটে চলল সে.

যদি দেখা হয়ে যায় মেয়েটির সঙ্গে এই আশায়। ইতোমধ্যে মিছিলটি ভেঙে গেছে।

নিজের সাবেক বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিল ও। শীঘ্রিই সমস্ত বৃত্তান্ত জানা হয়ে গেল তার।

'কিন্তু ফারফ্রে তো বাডমাউথ যায়নি, গেছে ওয়েদারবারি। ওখান থেকে যাবে মেলস্টক,' ফারফ্রেকে আনার জন্যে বাডমাউথে লোক গেছে শুনে ভয়ার্ত স্বরে জানাল হেঞ্চার্ড।

কিন্তু হেঞ্চার্ডের সুনামের ছিটেফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। কে শোনে তার কথা? অগত্যা হেঞ্চার্ড ঠিক করল, সে নিজেই যাবে ফারফ্রেকে খুঁজে আনতে।

দেরি না করে ওয়েদারবারির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ও। শহর ছাড়িয়ে মাইল তিনেক দূরে, এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামল হেঞ্চার্ড। কান পাতল। পাথুরে রাস্তার ওপরে চাকার হালকা শব্দ, সঙ্গে আবছা, টিমটিমে আলো।

পাশের পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে ফারফ্রের ক্যারিজ। গাড়িটার নিজস্ব একটা শব্দ আছে। আগে অবশ্য এটা হেঞ্চার্ডেরই ছিল, পরে তার দেউলিয়াপনার সুযোগে কিনে নেয় ফারফ্রে।

বড় রাস্তার বিশেষ একটি স্থানে অপেক্ষা করতে লাগল হেঞ্চার্ড, মেলস্টক গাঁ অভিমুখী রাস্তাটি যেখান দিয়ে গিয়েছে। মেলস্টক গেলে ক্যাস্টারব্রিজে ফিরতে ফিরতে আরও অন্তত দু'ঘণ্টা লেগে যাবে ফারফ্রের।

সহসা যুবকটির গাড়ির আলোয় উদ্ভাসিত হলো হেঞ্চার্ডের মুখখানা। ফারফ্রে আঁতকে উঠল ওকে দেখে। এই লোক একটু আগেই ওকে খুন করে ফেলতে চেয়েছিল।

'ফারফ্রে–মি. ফারফ্রে!' হাত উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল হেঞ্চার্ড।

মেলস্টকের রাস্তায় ঘোড়াটিকে কয়েক কদম ছুটতে দিল ফারফ্রে, তারপর রাশ টেনে ধরল। 'হ্যাঁ?' কাঁধের ওপর দিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধাল। শত্রুর সঙ্গে কথা বলছে এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

'এক্ষুণি ক্যাস্টারব্রিজে চলো!' তাগাদা দিয়ে বলল হেঞ্চার্ড। 'তোমার বাসায় ফেরা দরকার। জরুরী ব্যাপার। আমি তোমাকে এ কথাটা বলার জন্যেই ছুটে এসেছি।'

ফারফ্রে নিশ্চুপ, আর তাই লক্ষ করে মনটা দমে গেল হেঞ্চার্ডের। সে আগে কেন ভাবেনি ওকে এখানে দেখলে কি ভাবতে পারে যুবকটি। মাত্র চার ঘণ্টা আগে যাকে প্রায় জানে মেরে ফেলার দশা করেছিল, তাকে কিনা সেই একই লোক, নির্জন রাতে, বিশেষ একটি রাস্তায় পথ চলতে চাপাচাপি করছে! এবার হয়তো দলবল নিয়ে হামলা চালাতে চায় হেঞ্চার্ড–ভাবতে দোষ কি?

'আমাকে মেলস্টক যেতে হবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ফারফ্রে।

'কিন্তু,' অনুনয়ের সুর হেঞ্চার্ডের কণ্ঠে। 'ব্যাপারটা যে ভীষণ জরুরী! তোমার স্ত্রী–অসুস্থ। চলতি পথে সব খুলে বলব তোমাকে।'

হেঞ্চার্ডের উত্তেজিত-বিপর্যস্ত হাব-ভাব লক্ষ করে সন্দেহ আরও বাড়ল

ফারফ্রের–কোন বদমতলব আছে লোকটার। সে ঘোড়ার লাগাম ঝাঁকাতে ক্যারিজটা ফের চালু হলো।

'তুমি কি ভাবছ আমি জানি,' গাড়ির পাশে পাশে ছুটছে হেঞ্চার্ড, হতাশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। 'দয়া করে আমাকে ভুল বুঝো না! আমাকে বিশ্বাস করো, ফারফ্রে, তোমার স্ত্রীর সত্যিই বড় বিপদ। আমি এর বেশি আর কিছু জানি না, কিন্তু বাসার লোকজন তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে। তোমার এক লোক বাডমাউথে খুঁজতে গেছে। ও, ফারফ্রে, আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। আমি বাজে লোক সত্যি কথা, কিন্তু বিশ্বাস করো আমার মনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই!'

ফারফ্রে কিন্তু ওর কথা কানে তুলল না। ওর স্ত্রী আসন্ন প্রসবা একথা তো জানাই আছে, কিন্তু বাসা থেকে সে যখন বেরোয় তাকে বিলকুল সুস্থ দেখে এসেছে। জোরে ঘোড়া দাবড়াল ও, হেঞ্চার্ড পড়ে রইল পেছনে।

হতাশ-ক্লান্ত হেঞ্চার্ড ক্যাস্টারব্রিজ ফিরে এসে ফারফ্রের বাসায় গেল। দরজা খুলে যেতেই উদ্বিগ্ন কতগুলো মুখ ওর দিকে চেয়ে রইল। বাডমাউথের রাস্তা থেকে ফিরে এসেছে সেই সংবাদবাহক। সবাই আশা করেছিল হেঞ্চার্ড ঠিকই নিয়ে আসতে পারবে ফারফ্রেকে। 'ওঁকে পেলেন না?' ডাক্তার প্রশ্ন করল।

আমতা আমতা করে বলল হেঞ্চার্ড, 'ও দু'ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে।' দরজার কাছে একটা চেয়ার দেখে বসে পড়ল। এসময় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল এলিজাবেথ। 'ও কেমন আছে?' হেঞ্চার্ড জানতে চাইল।

'ভাল না, বাবা। স্বামীকে দেখার জন্যে খুব ছটফট করছেন। বেচারী–ওরা বোধহয় ওঁকে মেরেই ফেলল!'

হেঞ্চার্ড নীরবে মেয়েটিকে দু'মুহূর্ত নিরীখ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

শেষ অবধি ফারফ্রে এসে পৌঁছল। লুসেটা স্বামীকে কাছে পেয়ে উজ্জ্বল হলো। সারা রাত ওর পাশে বসে রইল ফারফ্রে। স্বামী ফেরা মাত্র তাকে সব কথা জানিয়ে বুকের ভার হালকা করতে চায় লুসেটা, কিন্তু বাধা দেয় ফারফ্রে। এখন বেশি কথা বলা ঠিক নয়। পরে সব শুনবে।

সে রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কি কি কথা-বার্তা হলো জানার উপায় নেই। সেগুলো জমা রইল ফারফ্রের বুকের মধ্যে।

ওদিকে বাইরে রাস্তার ওপর, ভয়ানক অশান্তিতে সময় কাটছে হেঞ্চার্ডের। এক বিন্দু স্বস্তি পাচ্ছে না সে। চারটের দিকে ফারফ্রের বাসার দরজা খুলে গেল। কড়ার উদ্দেশে কাজের মহিলাকে হাত বাড়াতে দেখল হেঞ্চার্ড। এক টুকরো কাপড় লাগানো ছিল কড়ার গায়ে, যাতে শব্দ না হয়। ওটা খুলে নেয়া হলো। ব্যাপারটা লক্ষ করে এগিয়ে এল হেঞ্চার্ড। 'ওটা খুলে ফেললে কেন?'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল মহিলা, দু'মুহূর্ত জবাব দিতে পারল না। তারপর ওকে চিনতে পেরে বলল, 'এখন যার খুশি, যত জোরে খুশি কড়া নাড়তে পারে–ওঁর আর কিছু আসবে যাবে না।'

বাড়ি ফিরে গেল হেঞ্চার্ড। লুসেটার মৃত্যু চিরতরে বন্ধ করে দিল শোভাযাত্রার পরিকল্পনাকারীদের মুখ। হেঞ্চার্ড-লুসেটার কেচ্ছা-কাহিনী আর কোনদিন উচ্চারিত হয়নি ওদের মুখে।

ঘরে আগুন জ্বেলে বসে রয়েছে হেঞ্চার্ড। শত্রুতা মানুষকে কতখানি নীচে নামিয়ে দিতে পারে, তাই ভাবছে। মানসিক এই দুরবস্থার সময়ে ওর জীবনে একমাত্র আশার আলো ওই এলিজাবেথ-জেন। মেয়েটি এখনও যথেষ্ট মায়া করে ওকে। আর এমুহূর্তে খাঁটি মনের একজন মানুষের কাছ থেকে মায়া-ভালবাসা পাওয়াটাই তো ওর জন্যে সবচাইতে জরুরী। কিন্তু এলিজাবেথ তো ওর সন্তান নয়। তবুও এই প্রথমবারের মত ওর মনে ক্ষীণ আশা জাগল, মেয়েটিকে হয়তো আপন সন্তানের মত ভালবাসতে পারবে।

সাত-পাঁচ ভাবছে, এ সময় কার যেন মৃদু পদশব্দ কটেজের উদ্দেশে এগিয়ে আসতে শোনা গেল। মানুষটি প্রবেশ করল ভেতরে। ওর ঘরের দরজায় আলতো টোকা দিল। প্রসন্ন হয়ে উঠল হেঞ্চার্ডের মুখ। এ নিশ্চয়ই এলিজাবেথ। ব্যথিত-ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

'খবরটা শুনেছ? মিসেস ফারফ্রে মারা গেছে! ঘণ্টা খানেক আগে।'

'শুনেছি। একটু আগেই ওখান থেকে ফিরলাম। তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, সারা রাত বসে ছিলে তো। তুমি ওপাশের ঘরটায় গিয়ে আরাম করো, নাস্তা তৈরি হলে আমি ডাক দেব।'

এলিজাবেথ ওর কথা মত বিছানায় গিয়ে সটান হলো। শব্দ পাচ্ছে সৎ বাবা পাশের কামরায় নড়েচড়ে নাস্তার আয়োজন করছে। লুসেটার অপ্রত্যাশিত, ভয়াবহ মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমে ঢলে পড়ল ও।

দশ

দরজায় টোকা, হেঞ্চার্ড সাড়া দিল। দোরগোড়ায় এক বলিষ্ঠ গড়নের লোক দাঁড়িয়ে, দেখে ধারণা হয় বিদেশী। হেঞ্চার্ড সম্ভাষণ জানাল তাকে।

কুশল বিনিময়ের পর আগন্তুক চওড়া হাসি হেসে শুধাল, 'আমি কি মি. হেঞ্চার্ডের সঙ্গে কথা বলছি?'

'আমার নাম হেঞ্চার্ড।'

'যাক, আপনাকে বাসাতেই পাওয়া গেল। কাজের পক্ষে সকালবেলাটাই ভাল। আপনার সাথে দুটো কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল হেঞ্চার্ড।

'আমাকে চিনতে পারছেন?' বসার পর বলল অতিথি।

হেঞ্চার্ড তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে মাথা নাড়ল।

'না পারারই কথা। আমার নাম নিউসন।'

হেঞ্চার্ডের চোখের আলো দপ করে নিভে গেল। আগন্তুক অবশ্য তা লক্ষ করল না। 'নামটার সাথে আমি খুব ভাল মতই পরিচিত,' অবশেষে বলল হেঞ্চার্ড।

'জানি। আমি প্রায় গত পনেরো দিন ধরে আপনাকে খুঁজছি। হ্যাভেনপুলে

নেমে ওখান থেকে ফলমাউথ যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি আপনি ক্যাস্টারব্রিজে থাকেন। তারপর কোচে চেপে সোজা এখানে, এই তো মিনিট দশেক হবে। আপনি কারখানার আশপাশে থাকেন জেনে এসেছি। আমার আসার কারণ বিশ বছর আগেকার সেই অদ্ভুত ঘটনা। আমার বয়স তখন কম ছিল; ও ব্যাপারে যত কম কথা হয়–আমার মনে হয় ভাল।'

'অদ্ভুত ঘটনা! বলুন তারচেয়েও জঘন্য কিছু। আমিই যে সেই লোক এ কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়। আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না, আর বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে মানুষ আবার মানুষ কিসের?'

'আমাদের তখন বয়স কম ছিল, অতশত বুঝতাম না,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল নিউসন। 'যাকগে ওসব কথা, আমি আপনার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে আসিনি। সুসান বেচারী ও ঘটনায় খুব কষ্ট পেয়েছিল। ভেবেছিলাম আমাকে পেয়ে ও সুখী হবে। সুখী হয়েওছিল। জানেন বোধহয় আপনার বাচ্চাটা মারা যায়। আমাদের আরেকটি মেয়ে হয়, বেশ আনন্দেই দিন কেটে যাচ্ছিল। পরে কাকে জানি ও আমাদের সব গোপন কথা জানায়। সে ওকে বলে আমাদের নাকি একসঙ্গে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তারপর থেকে ও কেমন জানি মুষড়ে পড়ে। ও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়, তখন প্রশ্ন ওঠে মেয়েটার কি হবে। এসময় এক লোকের পরামর্শ মেনে নিই আমি, সে যা করতে বলে তা-ই করি। তখন মনে হয়েছিল ওতেই সবার জন্যে মঙ্গল হবে। সুসানদের ফলমাউথে রেখে সাগরে চলে যাই আমি। আটলান্টিকের ওপারে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে আমাদের জাহাজ। সবাই ভাবে আরও অনেকের মত আমারও বুঝি সলিল সমাধি হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যগুণে বেঁচে যাই আমি, নিউফাউন্ডল্যান্ডের তীরে গিয়ে উঠি। সেসময় নিজেকে কেবলই প্রশ্ন করতাম, কি করব? শেষে ভেবেচিন্তে দেখলাম আমার ওখানে থেকে যাওয়াই ভাল। ও ভাবুক আমি মারা গেছি। বেঁচে আছি জানলে ওর জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আমি নেই জানলে ও হয়তো আগের স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। এতে আমাদের বাচ্চাটা একটা আশ্রয় পাবে। মাস খানেক আগে এদেশে আসি আমি। ফলমাউথে জানতে পারি সুসান মারা গেছে। কিন্তু আমার মেয়ে এলিজাবেথ-জেন–সে কোথায়?'

'সে-ও মারা গেছে,' পাথুরে গলায় বলল হেঞ্চার্ড। 'কেন, শোনেননি?'

আঁতকে উঠল নাবিক। 'মারা গেছে!' হাহাকারের মত শোনাল ওর কথাগুলো।

হেঞ্চার্ড মুখে কিছু না বলে মাথা দোলাল।

'কোথায় কবর দেয়া হয়েছে?'

'মায়ের পাশে,' আগের মতই ফাঁকা কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড।

'কবে মারা গেছে ও?'

'বছর খানেকের কিছু বেশি।' হেঞ্চার্ডের জবাবের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো নাবিক। হেঞ্চার্ডের দৃষ্টি মেঝেতে স্থির।

'এখানে এত কষ্ট করে এসে কোন লাভই হলো না!' অবশেষে বলল নিউসন। 'যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই চলে যেতে হবে। আমার কপালে সুখ

লেখা নেই। যাকগে, আপনাকে আর কখনও বিরক্ত করতে আসব না।'

পাথরের মেঝেতে অপসৃয়মাণ পদশব্দ শুনতে পেল হেঞ্চার্ড। ধীরে ধীরে খুলে আবার লেগে গেল দরজা। একবারের জন্যেও ঘাড় কাত করে চাইল না সে। জানালার পাশ দিয়ে মিলিয়ে গেল নিউসনের ছায়া।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল হেঞ্চার্ড। এ কি করল ও? নিউসন খুব শীঘ্রিই ওর মিথ্যেটা ধরে ফেলবে। শহরের লোকেরাই বলে দেবে। সে তখন ফিরে এসে শাপ-শাপান্ত করবে, তারপর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এলিজাবেথ-জেনকে!

ঝটপট হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে নিউসন যেদিকে গেছে অনুসরণ করল হেঞ্চার্ড। একটু পরেই রাস্তায় দেখতে পেল লোকটির পিঠ। হেঞ্চার্ড ওকে অনুগমন করতে গিয়ে লক্ষ করল কিংস আর্মসের কাছে থেমে দাঁড়াল নাবিক। সকালে পৌঁছনো কোচটি ওখানে দাঁড়িয়ে তখনও। নিউসন আবারও চেপে বসল ওতে, এবং ক'মিনিট পরেই ওকে নিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল গাড়িটা।

নিউসন মুহূর্তের জন্যেও হেঞ্চার্ডের কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করেনি। কিন্তু কদ্দিন বিশ্বাস করবে সে? মেয়েকে নিয়ে যেতে ফিরে আসবেই লোকটা। কথাটা চিন্তা করলেই বুকটা ভেঙে যেতে চায় হেঞ্চার্ডের। ওর–ওর এলিজাবেথ-জেনকে নিয়ে গেলে সে কি নিয়ে বাঁচবে?

বাড়ি ফিরে এল হেঞ্চার্ড। অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে হৃদয়–এলিজাবেথ বাসায় আছে তো? হ্যাঁ, আছে–ভেতরের কামরা থেকে ওই তো বেরিয়ে এল। ঘুম-ঘুম ভাবটা এখনও রয়ে গেছে চোখে-মুখে।

'উফ, বাবা, কী ঘুমটাই ঘুমালাম!' মৃদু হেসে বলল।

'বেশ করেছ,' বলে হেঞ্চার্ড ওর একখানা হাত পরম মমতায় নিজের হাতে তুলে নিল–ব্যাপারটা উপভোগ করল বিস্মিত মেয়েটি।

নাস্তা করতে বসে বাবাকে ধন্যবাদ জানাল এলিজাবেথ। সে পড়ে পড়ে ঘুমোল, আর তার বাবা কিনা এত কষ্ট করে নাস্তা বানাল।

'রোজই তো বানাচ্ছি,' জবাবে বলল হেঞ্চার্ড। 'তুমি চলে গেছ, আমাকে একা ফেলে সবাই চলে গেছে; নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়।'

'তুমি খুব একা, তাই না, বাবা?'

'হ্যাঁ, বাছা–কতখানি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! কিন্তু সেজন্যে তো আমিই দায়ী। তাও তোমাকেই যা একটু কাছে পাই। ক'দিন পর দেখা যাবে তুমিও আর আসছ না বুড়ো বাপের কাছে।' হেঞ্চার্ড নিশ্চিত, যে কোন মুহূর্তে ফিরে এসে মেয়েকে দাবি করে বসবে নিউসন। ও মিথ্যে বলেছে জানার পর ওকে ঘৃণা করবে এলিজাবেথ, ওর মুখ দেখতে চাইবে না আর।

'ও কথা বললে কেন?' হেঞ্চার্ডের চিন্তায় বাধা পড়ল এলিজাবেথের প্রশ্নে। 'আমি আসব, নিশ্চয়ই আসব–অবশ্য তুমি যদি চাও তবেই।'

হেঞ্চার্ড চাইবে না মানে? নাস্তার পরও রয়ে গেল সৎ-মেয়ে, হেঞ্চার্ড যতক্ষণ না কাজে বেরোল। শীঘ্রি আবার আসবে কথা দিয়ে বিদায় নিল এলিজাবেথ।

হেঞ্চার্ডের প্রতি এখন পর্যন্ত মমতা অনুভব করছে এলিজাবেথ–কিন্তু কদ্দিন? শীঘ্রিই হয়তো ঘৃণা করতে শুরু করবে।

সুসান, ফারফ্রে, লুসেটা, এলিজাবেথ–সবাই একে একে ছেড়ে গেছে ওকে, হয় ওর নিজের দোষে নয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে। জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছে হেঞ্চার্ড। ওর সামনে এখন কেবল নিরেট অন্ধকার। কোন কিছু প্রাপ্তির আশা নেই, নেই প্রাপ্তিযোগের আশায় বুক বাঁধার মত মনমানসিকতা। তারপরও হয়তো জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম ওকে নশ্বর এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবে আরও ত্রিশ কিংবা চল্লিশটা বছর। ততদিন মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে সবার ঘৃণা-তাচ্ছিল্য; জুটলে বড়জোর জুটতে পারে সামান্য করুণা।

ভাবনাটা অসহ্য ঠেকল ওর কাছে।

হেঞ্চার্ড সেই পাথুরে সেতুটার ওপর গিয়ে আরেকবার দাঁড়াল, দৃষ্টি নিবদ্ধ করল গভীর, খরস্রোতা পানিতে। চেয়ে থাকতে থাকতে হ্যাট ও কোট খুলে ফেলল। ওর মনোনীত মৃত্যুশয্যার, অর্থাৎ পানির উদ্দেশে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে, হঠাৎ কি যেন ভাসতে দেখল নদীর বুকে। প্রথম দর্শনে মানুষের মৃতদেহ বলে মনে হলো। লাশটা ওর চোখের সামনে দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল। কে ওটা? চরম আতঙ্ক নিয়ে হেঞ্চার্ড উপলব্ধি করল ওটা আর কেউ নয়–সে নিজে। মুখের চেহারা অন্যরকম হলে কি হবে, আদপে ওটা সে-ই।

অলৌকিক কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এমনি বোধ হলো তার। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মাথা নুইয়ে ফেলল। নদীর উদ্দেশে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিক্ষেপ না করে, হ্যাট-কোট তুলে নিয়ে, পরাজিত মানুষের মত হাঁটা ধরল।

কখন যেন কটেজের দরজার সামনে পৌঁছে গেল ও। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল এলিজাবেথ সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি এগিয়ে এসে ওকে যথারীতি 'বাবা' বলে মধুর সম্বোধন করল। নিউসন তারমানে এখনও এসে পৌঁছেনি।

'তোমাকে তখন খুব মন মরা দেখে গেছিলাম তো,' বলল মেয়েটি। 'তাই ভাবলাম যাই একবার। আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'আচ্ছা, এলিজাবেথ, তুমি কি বিশ্বাস করো অলৌকিক ঘটনা আজও ঘটে?'

'আজকাল আর ওসবে কেউ বিশ্বাস করে নাকি?'

'এসো আমার সাথে, একটা জিনিস দেখাই।'

হেঞ্চার্ড এলিজাবেথকে পেছনে নিয়ে সেতুটার ওপর এসে দাঁড়াল। তারপর মেয়েকে বলল, নেমে গিয়ে পানিতে কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখতে।

নেমে গেল এলিজাবেথ। একটু পরে জানাল, কি একটা যেন বারবার ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে পুরানো কাপড়ের একখানা পুঁটলি।

'আমারগুলোর মত কি?' হেঞ্চার্ডের প্রশ্ন।

'উম–হ্যাঁ। আমার মনে হয়–বাবা, চলো এখান থেকে চলে যাই!'

'কিন্তু তার আগে বলো, ওটা কি?'

'সেই পুতুলটা,' মুহূর্তে জবাব দিল এলিজাবেথ। 'ওরা যেটা নিয়ে মিছিল করছিল। তামাশা ফুরালে নদীতে ফেলে দিয়েছে। ভাসতে ভাসতে ওটা এখানে চলে এসেছে।'

'আহ–যা ভেবেছিলাম–আমার মূর্তি! কিন্তু আরেকটা কোথায়? একটা থাকবে কেন?…ওদের মিছিল লুসেটাকে খুন করেছে, কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে!'

এলিজাবেথ-জেন হেঞ্চার্ডের উচ্চারিত 'আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে'–এই শব্দগুলো নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। নদীর কাছ থেকে শ্লথপায়ে চলে আসছে, এসময় অর্থটা সহসা খেলে গেল তার মাথায়। 'বাবা!–তোমাকে এভাবে আমি একা থাকতে দেব না! আমি যদি তোমার সাথে থাকি, তোমার দেখাশোনা করি কোন আপত্তি আছে?'

'কিন্তু তুমি কি পারবে?' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল হেঞ্চার্ড। 'পারবে আমার দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে যেতে. পারবে না!'

'আমি ওসব মনে রাখিনি। তুমি আর কক্ষনো ওসব কথা তুলবে না,' শাসনের ভঙ্গিতে বলল।

সময় কেটে যায়। নিয়তি বুঝি আজকাল করুণাই করছে হেঞ্চার্ডকে। শহর কাউন্সিল ছোট্ট এক দোকান দান করেছে ওকে। বীজ, শিকড় এসব বেচবে। উদ্দেশ্য, এভাবে যদি নতুন জীবন গড়ে নিতে পারে হতভাগ্য মানুষটা।

চার্চইয়ার্ড দেখা যায় এই দোকানটা থেকে। এলিজাবেথ-জেন বাবার সঙ্গে বাস করবে বলে চলে এসেছে। বাইরে ওরা প্রায় বেরোয়ই না, আর বেরোলেও হাট বসার দিন ভুলেও নয়। কোন কোন দিন ডোনাল্ড ফারফ্রেকে দেখতে পাওয়া যায়, তাও সামনাসামনি নয়–রাস্তায় জনতার ভিড়ে।

সময় গেলে সব কষ্টবোধই ক্রমশ কমে আসে। ফারফ্রেও শিখে নিচ্ছে লুসেটাকে ছাড়া কিভাবে জীবন চালিয়ে নিতে হবে। ব্যবসায় ইদানীং তার মতি ফিরেছে।

বছর শেষে হেঞ্চার্ডের খুদে দোকানটা যথেষ্ট উন্নতি করল। ওরা বাপ-বেটি ওই রোদ খেলা-করা, আরামদায়ক দোকানটির মধ্যে মনের শান্তি খুঁজে পায়।

এলিজাবেথ এখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। বাবা ওর জন্যে যথাসাধ্য করে। হেঞ্চার্ডের মনে ভয় রয়ে গেছে, নিউসন যে কোন দিন ফিরে এসে ওর সামান্য সুখটুকু কেড়ে নেবে।

বাডমাউথের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে বড্ড ভালবাসে এলিজাবেথ। ওর ভাল লাগে এখান থেকে সাগর দেখতে–কিন্তু কেন যে বারবার এখানে ছুটে আসে নিজেও জানে না। বসন্তের এক দিন এমনি হাঁটতে বেরিয়েছে, ওর শূন্য ঘরের পাশে থমকে দাঁড়াল হেঞ্চার্ড। কর্ন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এলিজাবেথ, সেবারের কথা স্মরণ করল ও–এবং আজও ওর কামরায় উঁকি দিল। এ ঘরটা অনেক সাদামাঠা আগেরটির চাইতে, তবে ওকে যা অবাক করল তা হচ্ছে ঘরটা নানারকমের বই-পত্রে ভর্তি। এত বই কি ও নিজে কিনেছে নাকি? কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করছে হেঞ্চার্ড, এলিজাবেথ-জেনকে তো জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে! কিন্তু ওই প্রসঙ্গ তোলার আগেই ঘটল আরেকটি ঘটনা, যার ফলে ওর ঈর্ষাকাতর মনে আগুন জ্বলে উঠল।

শস্য বিক্রির রমরমা মৌসুম এবারের মত উতরে গেছে। কিছু করার নেই, তাই হাটের উদ্দেশে হাঁটা ধরল হেঞ্চার্ড। বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তখন নিবিষ্টমনে কি যেন দেখছিল ফারফ্রে। হেঞ্চার্ডকে লক্ষ করেনি সে। হেঞ্চার্ড তার দৃষ্টি অনুসরণ করতে দেখতে পেল, এলিজাবেথ-জেনের অগোচরে মন দিয়ে তাকে

লক্ষ করছে ফারফ্রে।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্রুদ্ধ হেঞ্চার্ড। ঘৃণায় অন্তরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তার। মেয়েকে হারাতে হতে পারে এই দুর্ভাবনায় শান্তি হারাম হয়ে গেল নিমেষে। সন্ধেবেলায় সে আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'এলিজাবেথ, আজকে কি তুমি মি. ফারফ্রেকে দেখেছ?' রীতিমত উত্তেজনার সুর তার গলায়।

বিমূঢ় দেখাল মেয়েটিকে। 'না তো,' বিভ্রান্ত কণ্ঠে জানাল।

'হ্যাঁ–তাই হবে–তাই হবে···আজকে রাস্তায় ওকে দেখলাম তো, তাই বললাম আরকি।' মেয়েটির বিচলিত ভাব লক্ষ করে ওর সন্দেহ হলো, দীর্ঘক্ষণের জন্যে হাঁটতে যাওয়া ও নতুন বইগুলোর সাথে ওই যুবকটির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কিনা। এখন থেকে চোখে চোখে রাখতে হবে এলিজাবেথকে।

এলিজাবেথের চলাফেরার মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই। কাকতালীয়ভাবে ডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে অবশ্য টুকটাক কথা-বার্তা বলে, মুখ ফিরিয়ে চলে যায় না। সে যে উদ্দেশ্যেই বাডমাউথের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করুক না কেন, ফিরতি পথে প্রায়ই তার দেখা হয়ে যায় ফারফ্রের সঙ্গে। আঁকাবাঁকা রাস্তাটিতে বিশ মিনিটের জন্যে হাঁটতে বেরোয় ফারফ্রে–সারাদিনের খাটুনির পর একটুখানি হাঁটাহাঁটি করলে নাকি ভাল লাগে। গোপনে নজরদারী করে ওদের সাক্ষাতের বিষয়টি জেনে ফেলার পর, দুঃখে-হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল হেঞ্চার্ড।

'ও এলিজাবেথকে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে ছিনতাই করে নিতে চায়!' মনে মনে আওড়ায়। 'ওর অবশ্য সে অধিকার আছে। আমি বাধা দেবার কে?'

দুনিয়ায় এ লোকটি ছাড়া অন্য আর কারও কাছে যদি হৃদয় খোয়াত এলিজাবেথ, কিচ্ছু মনে করত না হেঞ্চার্ড–হাসি মুখে মেনে নিত। কিন্তু এ সম্পর্ক সে সইতে পারবে না। ওরা যদি বিয়ে করে তবে যোগাযোগ রাখবে না হেঞ্চার্ডের সঙ্গে, ফলে বাকি জীবনটা নিঃসঙ্গ শূন্যতায় কাটাতে হবে ওকে। ফারফ্রের প্রতি অতীতে ও যা করেছে, তারপর আর আশা করা যায় না সে তার স্ত্রীকে হেঞ্চার্ডের সাথে মিশতে দেবে।

এরপর থেকে ভাবমগ্ন হয়ে পড়ল হেঞ্চার্ড। শরীর খারাপ হতে লাগল ঘন-ঘন। বাসার ওপরতলার একটি কামরা থেকে চোখ রাখতে শুরু করেছে সে এলিজাবেথের প্রতি, ইদানীং পুরানো এক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পাহারা দিচ্ছে বাডমাউথ রোড।

একদিন পাহারাদারী করতে উঠেছে, লক্ষ করল বাডমাউথের দিক থেকে এক আগন্তুক উদয় হলো। টেলিস্কোপটা তুলে ধরতে আতঙ্কে ওর জমে যাওয়ার জোগাড়। নিউসন! হাত থেকে খসে পড়ল কাঁচটা, ক'মুহূর্তের জন্যে নড়াচড়া করার ক্ষমতা লোপ পেল। ঠিক সে মুহূর্তে, নিচতলা থেকে এলিজাবেথ-জেনের হাঁটাচলার শব্দ কানে এল। হেঞ্চার্ড উপলব্ধি করল বাবার সঙ্গে এখনও তার দেখা হয়নি। নাহ্, এভাবে নিউসন-ভীতি বুকে পুষে রেখে ক্যাস্টারব্রিজে বাস করা সম্ভব নয়। লোকটা ওই এল বলে। তরতর করে নিচে নেমে এল ও।

'আমি ক্যাস্টারব্রিজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এলিজাবেথ-জেন।'

'চলে যাচ্ছ! আমাকে ফেলে?'

'হ্যাঁ, দোকানটা তুমি একাই সামলাতে পারবে। এ শহরে আমার আর ভাল লাগে না, আমি গ্রামে চলে যাব ঠিক করেছি–নিজের মত করে থাকব। তুমি তোমার মত থাকো।'

এলিজাবেথ নতমুখী হয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিল। সে ডোনাল্ড ফারফ্রের সঙ্গে দেখা করে বলে বাবা রাগ করে চলে যেতে চাইছে, মনে হলো ওর। বাবাকে মুখ ফুটে না বললেও সে নিশ্চয়ই কোনভাবে কথাটা জেনে গিয়েছে।

'আমি খুব দুঃখ পেলাম,' অতিকষ্টে বলতে পারল মেয়েটি। 'শিগ্‌গিরই হয়তো মি. ফারফ্রের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে, আশা করেছিলাম তুমি আপত্তি করবে না।'

'আমি তোমার কোন ব্যাপারেই আপত্তি করব না, এলিজাবেথ,' কোমল কণ্ঠে বলল হেঞ্চার্ড। 'আর আপত্তি করলেই বা কি? আমি শুধু চাইছি এখান থেকে চলে যেতে। আমি থাকলে ভবিষ্যতে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে; তারচেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।'

স্পষ্ট বোঝা গেল, এলিজাবেথের কোন কথায় কিংবা কাজে মত পরিবর্তন হবে না হেঞ্চার্ডের।

'তুমি তারমানে আমার বিয়েতে আসছ না,' অবশেষে বলল এলিজাবেথ।

'ও আমি পারব না–পারব না!' গলা চড়ে গিয়েছিল, এবার সুর নামিয়ে বলল, 'একটা কথা, আমার কথা ভুলে যাবে না তো? মাঝে মাঝে আমাকে মনে পড়বে তো? শহরের সবচেয়ে ধনী আর গুরুত্বপূর্ণ লোকটির বউ হবে–আমাকে একেবারে ভুলে যেয়ো না, বাছা। আমার অপরাধগুলোর কথা জানা হলে পরে হয়তো বিতৃষ্ণা জন্মাতে চাইবে, কিন্তু এটা জেনো; দেরিতে হলেও তোমাকে মন থেকে ভালবেসেছিলাম আমি।'

'এরজন্যে ডোনাল্ডই দায়ী,' ফুঁপিয়ে উঠল এলিজাবেথ।

'আমি ওকে বিয়ে করতে নিষেধ করছি না,' বলল হেঞ্চার্ড। 'কিন্তু কথা দাও, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না যখন–' সে বোঝাতে চাইল যখন নিউসন এসে পড়বে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিল মেয়েটি, এবং হেঞ্চার্ড সন্তুষ্টচিত্তে যাত্রার জন্যে তৈরি হলো। যন্ত্রপাতি ভর্তি নতুন এক ঝুড়ি কিনল, খড় কাটার ছোরাটা সাফ-সুতরো করল, কর্ডের নতুন ব্রীচেস ও জ্যাকেট কিনল–চিরদিনের জন্যে খুলে রাখল তার তথাকথিত ভদ্রলোকের পোশাকটি। ব্যবসায় পতনের পর থেকে যেটি পরে এসেছে সে।

সন্ধেবেলা ক্যাস্টারব্রিজ শহর ত্যাগ করল হেঞ্চার্ড। গোপনে বেরিয়ে গেল সে শহরটি ছেড়ে, যেটি তাকে যেমন অনেক দিয়েছে তেমনি আবার অনেক কিছু কেড়েও নিয়েছে। ওকে বিদায় জানাতে গিয়ে বেদনাতুর হয়ে পড়ল এলিজাবেথ, যেতে দেয়ার আগে ধরে রাখল এক-দু'মিনিট। হেঞ্চার্ডের অপসৃয়মাণ দেহটি যতক্ষণ চোখে পড়ে চেয়ে রইল ও। ওর অবশ্য জানা নেই, হেঞ্চার্ড প্রায় পঁচিশ বছর আগে যে সাজে এ শহরে প্রবেশ করেছিল সেই একই সাজে বেরিয়ে চলে

গেল। সেদিনও যন্ত্রের ঝুড়ি ছিল তার পিঠে, আর ঝুড়ি টপকে উঁকি দিচ্ছিল যন্ত্রপাতি। বয়সটা শুধু বেড়ে গেছে তার, চলনভঙ্গিতে গতি মন্থরতা এসেছে, আর নুয়ে পড়েছে পিঠ। এলিজাবেথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্যাস্টারব্রিজের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরতি পথে দেখা হয়ে গেল ডোনাল্ড ফারফ্রের সঙ্গে। বলাবাহুল্য, আজকে ওদের এটি প্রথম সাক্ষাৎ নয়।

'চলে গেছে?' উৎকণ্ঠা ফারফ্রের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' ব্যথার সুর ফুটল এলিজাবেথের গলায়। 'কিন্তু তুমি আমাকে কার সাথে দেখা করাতে চাও বলছিলে যেন?'

'ও হ্যাঁ, শিগগিরিই জানতে পারবে। আর মি. হেঞ্চার্ড যদি আশপাশের কোন এলাকায় থাকে তবে সে-ও জেনে যাবে।'

'থাকবে না–সে অনেক দূরে চলে যাবে!'

একসঙ্গে হেঁটে ফারফ্রের বাসায় এল ওরা। ফারফ্রে সিটিং-রুমের দরজাটা দড়াম করে খুলে বলল, 'এই যে, উনি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।' ঘরে প্রবেশ করল এলিজাবেথ। আরামকেদারায় বসে রিচার্ড নিউসন। বাপ-বেটির পুনর্মিলনের বর্ণনা না-ই বা দিলাম। স্নেহপ্রবণ বাবার সঙ্গে ছয় বছর আগে বিচ্ছেদ হয়েছিল, ভেবেছিল সে মারা গেছে, অথচ সেই মানুষটা কিনা জলজ্যান্ত বসে রয়েছে চোখের সামনে! মুহূর্তের মধ্যে হেঞ্চার্ডের বিদায় ঘটনার ব্যাখ্যা দান হয়ে গেল। হেঞ্চার্ডের সঙ্গে ওর সত্যিকারের কি সম্পর্ক জানার পর অবিশ্বাস করতে পারল না এলিজাবেথ, কেননা হেঞ্চার্ডের আচার-ব্যবহারে তার প্রমাণ মেলে।

গর্বিত পিতা নিউসনের মুখে বাক্য সরতে চায় না। চুমোর পর চুমো খাচ্ছে মেয়েকে।

'আপনাকে তো বলিনি, মি. ফারফ্রে,' অবশেষে বলল নিউসন, 'হেঞ্চার্ড কিভাবে আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়?'

মাথা নাড়ল ফারফ্রে।

'ভেবেছিলাম কাউকে বলব না। কি দরকার লোকটার নামে শহরে বদনাম ছড়িয়ে। কিন্তু চলে যখন গেছেই তখন বলা যায়। গত হপ্তায় তো আপনার সাথে দেখা হলো, তার নয়-দশ মাস আগে ক্যাস্টারব্রিজে আরেকবার আসি আমি। লোক মুখে হেঞ্চার্ডের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে এক সকালে দেখা করতে যাই। বুড়ো শয়তানটা আমাকে বলে কিনা আমার এলিজাবেথ-জেন মারা গেছে!'

বাবার কথা শুনছে, এলিজাবেথের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

'আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি লোকটা মিথ্যে কথা বলছে,' কথার খেই ধরল নিউসন। 'আমি এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে, সোজা আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে আসা কোচটায় গিয়ে উঠে বসি। হা-হা!–ভালই ঠক দিয়েছে আমাকে, লোকটার তারিফ করতে হয়!'

এলিজাবেথ-জেন হতবাক। 'তুমি হাসছ, বাবা? ওই লোকটার জন্যেই তো এত দেরি হলো, নইলে সেই কবেই তো আমাদের দেখা হত!'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল নিউসন।

'তার এরকম করাটা ঠিক হয়নি!' বলল ফারফ্রে।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল এলিজাবেথের। 'আমি বলেছিলাম তাকে কোনদিন ভুলব না। কিন্তু এখন আর তার উপায় আছে!'

'ও অবশ্য,' খানিকটা হেঞ্চার্ডের পক্ষ টেনে বলল নিউসন, 'অল্প কয়েকটা কথা বলেছিল। আর আমি যে বোকার মত ওর সব কথা বিশ্বাস করব ও কি করে জানবে? দোষ ওর চেয়ে আমারও কম না। বেচারী!'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করল এলিজাবেথ। 'সে জানত তুমি কেমন–জানত তুমি সবাইকে বিশ্বাস করো। মাকে অজস্রবার একথা বলতে শুনেছি। ওই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে সে। পাঁচ বছর ধরে আমার বাবার অভিনয় করে, শেষে এমন ধোঁকা দেয়াটা তার মোটেই উচিত হয়নি।'

'বাদ দে, মা, বাদ দে। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে,' খোশমেজাজে বলল নিউসন। 'এখন আয়, তোর বিয়ের প্ল্যান-প্রোগ্রাম করি।'

ওদিকে যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়েছে, পুবদিক লক্ষ্য করে পা চালিয়েছে হেঞ্চার্ড, তারপর খুঁজে নিয়েছে বিশ্রামের জন্যে একটুখানি জায়গা। একটা মাঠে প্রবেশ করে, অবসন্ন শরীরে সটান হয়েছে এক খড়ের গাদার নিচে। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা ঠাঁই পায়নি মাথায়।

একটানা পাঁচদিন হাঁটল সে, ষষ্ঠ দিনে স্পষ্ট হলো তার গন্তব্য ওয়েডন-প্রায়র্স। বিখ্যাত সেই পাহাড়টি, একসময় যেখানে মেলাটা বসত–এখন জনমানবশূন্য। গোটা কয়েক ভেড়া ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হেঞ্চার্ডকে লক্ষ্য করে ছুটে পালাল। ঝুড়িটা নামিয়ে রাখল ও, সিকি শতাব্দী আগের ঘটনাটি স্মরণ করল বেদনার্ত কৌতূহলের সঙ্গে।

'হ্যাঁ, আমরা ওদিক দিয়েই এসেছিলাম,' মনে মনে বলল। 'ওর কোলে ছিল বাচ্চাটা, আর আমি পড়ছিলাম একটা গান।' তাঁবুটা কোথায় ছিল দেখার জন্যে খানিকদূর হেঁটে এক জায়গায় এসে থামল ও। ওর মনে হলো এটিই সেই জায়গা, যদিও বাস্তবে তা নয়। তারপর তাঁবুতে ঢোকার পর কি কি ঘটেছিল একে একে মনে করতে লাগল। কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তাঁবু ছেড়ে নিউসনের সঙ্গে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে সুসান।

হেঞ্চার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিক্ত স্মৃতিগুলো যেন বন্যার পানির মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল ওকে–ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্যাস্টারব্রিজে অবিশ্বাস্য উত্থান ও মর্মান্তিক পতন। 'কি পেলাম জীবনে?' বলল আপন মনে।

অবশেষে হে-মেকার হিসেবে একটা কাজ জুটল ওর। একদিন এক মাঠে গেটের ধার ঘেঁষে কাজ করছে, এমনিসময় এক ওয়াগন চালকের কণ্ঠে শুনতে পেল 'ক্যাস্টারব্রিজ' শব্দটি। অমনি দৌড়ে তার কাছে চলে এল হেঞ্চার্ড।

'হ্যাঁ–ওখান থেকেই আসছি,' হেঞ্চার্ডের প্রশ্নের জবাবে বলল লোকটি।

'ওখানকার খবর-টবর কি?' এলিজাবেথের কোন খবর আছে কিনা জানতে চায় আসলে।

'সব আগের মতই চলছে।'

'মেয়র সাহেব, মানে মি. ফারফ্রে নাকি বিয়ে করছেন? কথাটা কি সত্যি?'

চাপ দিল হেঞ্চার্ড।

'বলতে পারি না, তবে শুনলাম শীঘ্রিই নাকি একটা বিয়ে হতে যাচ্ছে–সেন্ট মার্টিনস ডে-তে।'

তখনকার মত কাজে ফিরে গেল হেঞ্চার্ড। কিন্তু দু'দিন পর ঠিক করল, ফলাফল যা-ই হোক না কেন, যাবে সে। নিজেকে বুঝ দিতে চেষ্টা করল, নিউসন হয়তো আসেইনি, কিংবা এসে থাকলেও চলে গেছে–আর এলিজাবেথ হয়তো মনে মনে ভাবছে, বিয়েতে হেঞ্চার্ডের উপস্থিত থাকাটা জরুরী ছিল।

তিন দিন লাগল ওর ক্যাস্টারব্রিজ পৌঁছতে, তৃতীয় দিনের সন্ধেয় এসে পৌঁছল ও। দ্বিতীয় দিনে, যাত্রাপথে এক শহরে বিরতি নেয়–নতুন এক প্রস্থ পোশাক কেনার জন্যে। কেননা, দু'মাসের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ওর পরনের পোশাকটির বেহাল দশা। নিজের বেশভূষায় যখন নিঃসন্দেহ হলো এলিজাবেথের অসম্মান হবে না, তখন বিয়েতে কি উপহার দেয়া যায় ভাবতে লাগল।

কি দেবে? রাস্তার এমাথা-ওমাথা অবধি হাঁটাহাঁটি করল, জরিপ করল সব কটা দোকানের জানালা। শেষ পর্যন্ত মনে ধরল একটি খাঁচাবন্দী পাখি। টাকা যেহেতু আছে কিনতে বাধা কি? ওটা কিনে আবার যাত্রা শুরু করে সে।

ক্যাস্টারব্রিজে প্রবেশ করতে শুনতে পেল গির্জার উৎসবমুখর ঘণ্টাধ্বনি–ঘোষণা করা হচ্ছে এলিজাবেথ-জেন ও ডোনাল্ড ফারফ্রে এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী। এক লোক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানিয়ে গেল, বাড়ি ভর্তি অতিথি নিয়ে নাচ-গান-বাজনা আয়োজন করেছে নববিবাহিত দম্পতি।

হেঞ্চার্ড কর্ন স্ট্রীটের উদ্দেশে হেঁটে চলল। আলোয় ঝলমল করছে তার সাবেক বাড়িটি, আর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক দল দর্শক মজা লোটার চেষ্টা করছে। সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারল না হেঞ্চার্ড। তাই সামনে দিয়ে না ঢুকে নিঃসাড়ে চলে এল পেছন দিকে, তারপর রান্নাঘর দিয়ে প্রবেশ করল ভেতরে। তার আগে অবশ্য বাইরে এক ঝোপের তলে খাঁচাবন্দী পাখিটিকে রেখে এসেছে–আশা করছে ও যে অনাহূত অতিথির মত এসেছে, সেই বেমানান ঘটনাটি এতে করে খানিকটা চাপা পড়তে পারে।

কেন যে ঝোঁকের মাথায় চলে এল হেঞ্চার্ড! এই আনন্দমুখর পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না সে। কিচেনে তাকে অবশ্য আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করল হাউজকীপার গোছের এক বৃদ্ধা। সে হচ্ছে তেমন ধরনের মানুষ, কোন কিছুতেই যারা বিস্মিত হয় না। তাকে যখন বলা হলো গৃহকর্ত্রীকে ডেকে আনতে, একজন পুরানো বন্ধু দেখা করতে চায়, খুশি মনে কাজটা করতে চলে গেল সে।

সে বড় ঘরটিতে যেই পৌঁছেছে, অমনি নাচ শুরু হয়ে গেল। বৃদ্ধা ফিরে এসে হেঞ্চার্ডকে জানাল, মি. ও মিসেস ফারফ্রে দু'জনেই নাচছে, নাচ শেষ হলে গৃহকর্ত্রীকে জানাবে সে।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি বুলোতে পারছে হেঞ্চার্ড, কিন্তু ওর মেজাজের সাথে ঠিক মানানসই হচ্ছে না এবাড়ির আনন্দ-ফুর্তি। একটা বিষয় বুঝে উঠতে পারছে না ও। ফারফ্রের মত শান্তশিষ্ট লোক তার দ্বিতীয় বিয়ে উপলক্ষে এত ধুমধাম করছে কেন? এলিজাবেথও তো খানিকটা লাজুক স্বভাবের মেয়ে, নাচ-টাচ

পছন্দ করে না বড় একটা।

এলিজাবেথকে এক ঝলক দেখে বুকটা টনটন করে উঠল ওর। শ্বেতশুভ্র পোশাক পরে রয়েছে, কিন্তু উচ্ছল আনন্দের বদলে মুখের চেহারায় ওর অনিশ্চয়তার ছায়া। ফারফ্রের সাথে নাচছে না ও। হেঞ্চার্ড সহসা ওর সঙ্গীর মুখখানা দেখতে পেল। নিউসন। এত আনন্দের উৎস তাহলে ওই লোকটাই, উড়ে এসে হেঞ্চার্ডের জায়গাটা যে জুড়ে বসেছে।

হেঞ্চার্ড নাগালের মধ্যেকার দরজাটা ঠেলে ভেজিয়ে দিল, এবং বেশ ক'মুহূর্ত ওখানে নিস্পন্দ বসে রইল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। সে জানে না নাচ থেমে গেছে। ইতোমধ্যে হাউজকীপার ওর কথা বলে দিয়েছে এলিজাবেথকে, এবং সে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই মেয়েটি ওর সামনে হাজির হয়ে গেছে।

'ওহ–মি. হেঞ্চার্ড!' বলে সভয়ে পিছু হটে গেল।

'কি, কি বললে?' ওর হাত চেপে ধরেছে লোকটা। 'মি. হেঞ্চার্ড? আর যা-ই বলো ও নামে ডেকো না! মন চাইলে আমাকে অপদার্থ বুড়ো হেঞ্চার্ড–কিংবা যা খুশি তাই বলতে পারো–কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না! আমি জানি, বাছা, তোমার আসল বাবা এসে গেছে। তুমি সবই জেনে গেছ, কিন্তু দোহাই লাগে, আমাকে একেবারে ভুলে যেয়ো না–একটু করুণা কোরো–তোমার মনের কোণে আমাকে সামান্য ঠাঁই দিয়ো!'

লজ্জা পেল এলিজাবেথ, আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিল হাতখানা। 'আপনাকে আমি চিরকাল ভালবাসতাম–খুশি মনে বাসতাম,' বলল। 'কিন্তু আপনি যেভাবে আমাকে ঠকিয়েছেন তারপর আর ওসব কথা ভাবা যায় না! আমার বাবাকে আপনি পর ভাবতে শিখিয়েছেন, বছরের পর বছর সত্যটা আমার কাছ থেকে গোপন করেছেন। আর আমার ভালমানুষ বাবা যখন আমাকে খুঁজতে এসেছে, তাকে আমি মরে গেছি বলে নিষ্ঠুরের মত বিদায় করে দিয়েছেন। যে লোক এসব করতে পারে, তাকে কেউ ভালবাসতে পারে!'

হেঞ্চার্ড কিভাবে বলবে এলিজাবেথ সম্পর্কে সে নিজেও ধোঁকা খায়, তার ভুল ভাঙে সুসানের চিঠি পাঠ করে–কেবল তখনই সে জানতে পারে তার আপন সন্তান মারা গেছে? এলিজাবেথ-জেনকে সে সন্তানের মত ভালবেসে ফেলেছিল বলেই তো শেষ মিথ্যে কথাটা বলতে বাধ্য হয়, এসব কথা কে বোঝাবে মেয়েটিকে? আর বোঝাতে গেলেও কি হতভাগ্য পিতার অন্তরের বেদনা স্পর্শ করবে এলিজাবেথকে?

'আমি চাই না আমার জন্যে তোমাদের শুভ দিনটা মাটি হোক,' হেঞ্চার্ডের অহঙ্কার মেয়েটির কাছে তাকে সাফাই গাইতে বাধা দিল। 'আমার আসাটাই আসলে ভুল হয়েছে। এবারের মত আমাকে মাফ করে দাও। আমি আর কোনদিন তোমাকে জ্বালাতন করতে আসব না, এলিজাবেথ-জেন, জীবন থাকতে না! ভাল থেকো। আসি!'

এলিজাবেথ-জেন কিছু বলতে পারার আগেই চোখের আড়াল হয়ে গেল হেঞ্চার্ড। তাকে আর কখনও দেখেনি সে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের পর এক মাস কেটে গেছে। এলিজাবেথের বাবা সাগরের কাছাকাছি বাস করার উদ্দেশ্যে চলে গেছে। নব দম্পতি সংসার জীবনে আস্তে আস্তে মানিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছে। একদিনের কথা। এলিজাবেথ নিজের হাতে একটি কামরা গোছগাছ করছে, এসময় এক মেইড এসে খবরটা দিল, 'খাঁচাটা ফেলবেন না, ম্যাম, ওটা কিভাবে এখানে এল জানতে পেরেছি।'

বিয়ের সপ্তাহখানেক পর খাঁচাটা আবিষ্কার করে এলিজাবেথ, পাখিটা অনাহারে মরে পড়ে ছিল ভেতরে। কেউ বলতে পারেনি ওটা কোত্থেকে, কিভাবে এল। মেইড বলে চলল, 'যে চাষী লোকটা বিয়ের দিন সন্ধেবেলা এসেছিল, রাস্তায় তার হাতে দেখা গেছে এটা।'

এলিজাবেথকে ভাবনায় ফেলে দিতে এটুকুই যথেষ্ট। ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, খাঁচার পাখিটা দ্বৈত অর্থবহ–একইসঙ্গে বিয়ের উপহার ও হেঞ্চার্ডের অনুশোচনার প্রতীক। মুহূর্তে মনটা ওর নরম হয়ে এল। স্বামীকে নিয়ে হেঞ্চার্ডের খোঁজে না বেরোনো অবধি স্বস্তি পেল না।

হেঞ্চার্ড কোথায় চলে গেছে বের করা সহজ কাজ নয়, তবে শেষ পর্যন্ত ফারফ্রে নানা জায়গায় তদন্ত করে ওকে নিয়ে এল ক্যাস্টারব্রিজ থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে। 'এই, ওই লোকটাকে হুইটলের মত লাগছে না?' নিশ্চিত হতে পারছে না এলিজাবেথ-জেন, রাস্তার পাশে চকিতে-দেখা এক লোকের উদ্দেশে আঙুল ইশারা করল।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল ডোনাল্ড। 'ও তিন হপ্তা ধরে কাজে আসছে না। দু'দিনের মজুরি পাবে আমার কাছে, টাকাটা কার হাতে দেব বুঝতে পারছি না।'

লোকটা ছোট্ট এক কুটিরের উদ্দেশে দৌড় দিয়েছিল, তাই লক্ষ করে, ওরাও তাকে অনুসরণ করে কুটিরের দরজায় এসে টোকা দিল। হ্যাঁ, অ্যাবেল হুইটলই বটে। টোকার জবাবে সে-ই সাড়া দিল, এবং ওদের চিনতে পেরে রীতিমত আঁতকে উঠল।

'তুমি এখানে কি করছ, অ্যাবেল হুইটল্?' ফারফ্রে জবাব চাইল।

'ওহ্, স্যার, উনি আমার সঙ্গে যা-ই করুন না কেন, আমার মা বেঁচে থাকতে তো তার প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন।'

'কার কথা বলছ?'

'ও, স্যার–মি. হেঞ্চার্ড। আপনি জানতেন না? উনি একটু আগে মারা গেছেন, এই আধ ঘণ্টা আগে।'

'মারা গেছে?' এলিজাবেথ আর্তস্বরে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, ম্যাম, উনি আর নেই। মার অভাবের সময় কয়লা, আলু, এটা-সেটা কত কিছু দিয়েই না সাহায্য করতেন। আপনাদের বিয়ের দিন রাতে ওঁকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম, ভীষণ ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল। আমি ওঁর পিছু নিই। উনি আমাকে কয়েকবার বলেন চলে যেতে, কিন্তু আমি শুনিনি। আমি বলি, আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে, তাই আপনার সাথে সাথে থাকতে চাই–কেননা আপনি আমার মাকে দুর্দিনে অনেক সাহায্য করেছেন। উনি এরপর আর কিছু বলেননি। সারা রাত একসাথে হাঁটি আমরা। সকালের দিকে দেখি ওঁর আর শরীর

চলছে না, তাই এই খালি কুটিরটায় এনে তুলি। "হুইট্‌ল্‌, তুমি আমার মত একটা বাজে লোকের জন্যে কেন এত কষ্ট করছ?" প্রায়ই বলতেন উনি। বেচারা আর শক্তি ফিরে পাননি, খেতেও পারতেন না–খাওয়ার রুচিই ছিল না। দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, শেষে আজ তো মারাই গেলেন।'

'আহ্‌হা রে!' অস্ফুটে বলল ফারফ্রে।

এলিজাবেথ নিশ্চুপ।

'উনি একটা কাগজে কি সব লিখে পিন দিয়ে আটকে রাখেন বিছানায়,' কথার খেই ধরল হুইট্‌ল্‌। 'পড়তে জানি না তো, তাই কি লিখেছেন বলতে পারি না। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি।'

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, আর হুইট্‌ল্‌ এক দৌড়ে কটেজের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে এক টুকরো দলামোচড়া কাগজ নিয়ে ফিরে এল। ওতে যা লেখা ছিল তা এরকম:

মাইকেল হেঞ্চার্ডের উইল–

এলিজাবেথ-জেন ফারফ্রেকে আমার মৃত্যুসংবাদ জানানো চলবে না, কিংবা আমার জন্যে তাকে শোক পালন করতে বাধ্য করা যাবে না।

এবং আমাকে গির্জাপ্রাঙ্গণে কবর দেয়া যাবে না।
এবং আমার জন্যে ঘণ্টাধ্বনি বাজবে না।
এবং কেউ আমার মৃতদেহ দেখবে না।
এবং আমার কফিনের পেছনে কেউ হাঁটবে না।
এবং আমার কবরে ফুল দেয়া চলবে না।
এবং কোন মানুষ আমাকে মনে রাখবে না।
আমি সজ্ঞানে এতে স্বাক্ষর করছি।

মাইকেল হেঞ্চার্ড

'এখন কি করা?' এলিজাবেথের হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে বলল ডোনাল্ড।

পরিষ্কার জবাব দিতে ব্যর্থ হলো এলিজাবেথ। 'ওফ, ডোনাল্ড,' অবশেষে ধরা গলায় বলল, 'কত কষ্ট পেয়েই না কথাগুলো লিখেছে! আহ্‌, শেষ যেদিন দেখা হলো সেদিন কেন যে অমন দুর্ব্যবহার করতে গেলাম···এই আফসোস আমার জীবনেও যাবে না! কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই–যা বলেছে তাই করতে হবে।'

***

টমাস হারডি - এর

দ্য মেয়র অব ক্যাস্টারব্রিজ

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

হঠকারী, গোঁয়ার যুবক মাইকেল হেঞ্চার্ড যখন মদের নেশায় বুঁদ হয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে বেচে দিতে চাইল, সে ভাবতেও পারেনি কেউ তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু করল একজন।
নগদ টাকা গুনে দিয়ে ওর স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে নিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল তাবু থেকে। এরপর কেটে গেল প্রায় আঠারো বছর। হেঞ্চার্ডের স্ত্রী সুসান ও তরুণী কন্যা এলিজাবেথ-জেন ওকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হল ক্যাস্টারব্রিজে।
হেঞ্চার্ডের অতীত অপকর্মের কথা কি তা হলে এবার জানাজানি হয়ে যাবে? এখন কি করবে ও?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০